হাদীস পাঠ

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক

হাদীস পাঠ

হাদীস পাঠ

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক

হাদীস পাঠ

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
E-mail : info@quantummethod.org.bd

গ্রন্থস্বত্ব : **লেখক**

প্রথম প্রকাশ

মাহে রমজান ২০২৫

মুদ্রাকর

প্রজ্ঞাপ্রকাশ
ইসলাম ভবন (২য় তলা)
৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড, ঢাকা-১০০০

মূল্য

২৭০ টাকা
[এ বই থেকে প্রাপ্ত আয় সৃষ্টির সেবায় নিবেদিত]

ISBN : 978-984-35-7459-6

Hadis Path (Reflections on Hadith)

By : **Shahid El Bukhari Mahajataq**

Published by

Quantum Foundation
quantummethod.org.bd

Price : 15$
[All earnings dedicated to charity]

উৎসর্গ

উম্মুল মোমেনিন।
রসুলের (স) সুখ-দুঃখের সাথি।
তাঁর জীবনাচার ও নির্দেশনার
বিশ্বস্ত সংরক্ষক।
পরিবার ও সমাজে
ইসলামের উদার চেতনা বিকাশে
তারা কাজ করেছেন সর্বত্র—
ঘরে বাইরে রণক্ষেত্রে।
তাদের প্রতি সালাম।

বালাগাল উলা বি-কামালিহি
কাশাফাদ্দুজা বি-জামালিহি
হাসুনাৎ জামিয়ু খিসালিহি
সাল্লু আলায়হি ওয়া আলিহি।

—শেখ সাদী (র)

শূন্য থেকে পূর্ণতায় তুমি নিজ মহিমায়
ঘোর আঁধার দূর হলো তোমার আলোকপ্রভায়
চরিত্রে তোমার শুদ্ধাচারের প্রকাশ তামাম
তোমার করুণাধারার প্রতি হাজার সালাম।

সূচিপত্র

হাদীস কেন পড়বেন?	৯
জ্ঞান	২১
শুকরিয়া : প্রাচুর্যের শুরু	২৬
সালাম : রহমত ও বরকতের উৎস	৩৩
নিয়ত : সকল কর্মের অঙ্কুর	৩৯
দৃষ্টিভঙ্গি : বাস্তবতা বদলে দেয়	৪৫
অপ্রয়োজনীয়-অপ্রাসঙ্গিক কথা	৪৮
নিরাপত্তাবোধের উৎস	৫৩
বিতর্ক এড়ানোর গুরুত্ব	৫৭
সম্পদ ও ভোগের দৃষ্টিভঙ্গি	৬০
ঋণ : সর্বস্বান্ত করার ফাঁদ	৬৫
সাদাকা-সৎকর্ম : আসল সঞ্চয়	৭২
ইসলাম : শান্তি ও কল্যাণ	৭৬
আল্লাহ ও আল্লাহ-সচেতনতা	৮১
বায়াত : পরিত্রাণের উপায়	৮৬
বিশ্বাস ও বিশ্বাসী	৯১
স্বপ্ন : অনেক কিছুই বলে দেয়	৯৬
মা-বাবা : পরম আপনজন	১০৩
বিয়ে ও দেনমোহর : সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি	১১০
স্বামী-স্ত্রী : পারস্পরিক দায়িত্ব	১১৮
প্যারেন্টিং	১২৩
আত্মীয় প্রতিবেশী	১৩২
শপথ-অভিশাপ	১৪০
নারী অধিকার	১৪৮
এতিমের অধিকার	১৫৭
শ্রমিক ও মজুরের অধিকার	১৬০
সদকায়ে জারিয়া : বহমান সৎকর্ম	১৬৫
রোগ নিরাময় ও রোগী দেখার আদব	১৭৬
মৃত্যু : নতুন আনন্দলোক	১৮৩

হাদীস কেন পড়বেন?

হাদীস নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন—বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ তো সংকলিত হয়েছিল নবীজীর (স) ওফাতের প্রায় দুইশ বছর পর। কোরআন লিপিবদ্ধ হয়েছিল নবীজীর জীবদ্দশায়, এটা ঠিক আছে। কিন্তু হাদীস গ্রন্থাকারে সংকলিত হতে হতে তো দুইশ বছর পার হয়ে গেছে। একজনের কাছ থেকে আরেকজন। তার কাছ থেকে আরেকজন। অনেক বর্ণনাকারীর হাত হয়ে তা পৌঁছেছে ইমাম বোখারী বা ইমাম মুসলিমের কাছে। এত বর্ণনাকারীর হাতে পড়ে নবীজীর (স) বাণীর বিশুদ্ধতা নিয়ে সংশয় থাকাটাই তো স্বাভাবিক। ইউরোপের ওরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্যবিদরা খুব কৌশলেই সংশয়টা ছড়িয়েছেন আধুনিক সমাজে।

আসলে হাদীস কী? নিঃসন্দেহে বলা যায়, হাদীস কোনো জ্ঞানীর তত্ত্বকথা নয় যা জীবনের সাথে সম্পর্কহীন, অথবা কোনো কেতাবি দার্শনিকের জটিল বাক্যের ফুলঝুড়ি নয়। হাদীস হচ্ছে এমন এক মহামানবের জীবনাচার—যিনি একাধারে ধর্ম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক, রাষ্ট্রনায়ক,

সেনানায়ক, বিচারক হিসেবে যেমন অতুলনীয় তেমনি ছিলেন আদর্শ সহযোদ্ধা, স্বামী, পিতা, পিতামহ, আত্মীয় ও প্রতিবেশী। তাঁর অনুসারী, সাহাবী বা সহচর সঙ্গীসাথিদের কাছে তিনি ছিলেন আদর্শ। কোরআনের শিক্ষার ফলিত রূপ ছিল তাঁর জীবনাচার।

দেহ-মন-আত্মার যত্ন তিনি যেভাবে নিয়েছেন, যেভাবে নিতে বলেছেন—সাহাবীরা সে কথা শুধু শোনেন নি, নিজেদের জীবনে তা অনুসরণ করতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তাই হাদীস তাদের জন্যে কোনো তত্ত্বকথা ছিল না, পরিণত হয়েছিল তাদের প্রত্যেকের জীবনের অনুষঙ্গে। নবীজী যে আন্তরিকতায় সাহাবীদের সুস্থ জীবনাচার শিখিয়েছেন, একই আন্তরিকতায় তারা শিখিয়েছেন তাবেঈনদের এবং তাবেঈনরা শিখিয়েছেন তাবে-তাবেঈনদের। মধ্যযুগে প্রাচ্যে যে আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, তার ভিত্তিই ছিল কোরআনের ফলিত রূপ নবীজীর (স) জীবন ও হাদীসের জ্ঞান। হাদীস পাঠ, হাদীসের জ্ঞান তখন শুধু নৈতিক শিক্ষায় সীমাবদ্ধ ছিল না, ছিল রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার অবিচ্ছেদ্য উপকরণ।

সহজ কথায় বলা যায়, হাদীসের জ্ঞান হচ্ছে একজন মানুষকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আত্মিকভাবে পরিপূর্ণ মানুষে রূপান্তরিত করার সহজ পথ। তাই নিজের জীবনাচারে নবীজীর শিক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর ব্যাপারে সাহাবীদের আগ্রহের কোনো অভাব ছিল না। নবীজী (স) মদিনায় হিজরত করার পর এ সুযোগ আরো বেড়ে যায়।

একদল সাহাবী তো আসহাবে সুফফায় সবসময়ই থাকতেন নবীজীর (স) মুখনিঃসৃত বাণী আত্মস্থ করার জন্যে।

আনাস ইবনে মালেক (রা) নবীজীর (স) বাণী লিখে আবার তা ঠিক আছে কিনা তাঁকে দেখিয়েও নিতেন। কোনো ভুল থাকলে তা সংশোধন করতেন। আনাস (রা) খুব ভাগ্যবান দীর্ঘায়ু মানুষ। তার মা উম্মে সুলাইম (রা) ১০ বছর বয়সে তাকে নবীজীর (স) হাতে তুলে দেন। নবীজীকে (স) তিনি বলেন, আমার ছেলে বুদ্ধিমান এবং পড়তে লিখতে পারে। আপনি তাকে আপনার ব্যক্তিগত খাদেম হিসেবে গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন।

আনাস (রা) নবীজীর (স) ওফাত পর্যন্ত তাঁর দৈনন্দিন জীবনাচারের খুব ঘনিষ্ঠ সাক্ষী। তিনি ৯১ হিজরি পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং তিনি তার উত্তরসূরিদেরও সবসময় হাদীস লিখে রাখতে উদ্বুদ্ধ করতেন। প্রয়োজনে বিশেষ বাক্সে রাখা প্যাপিরাস বা পার্চমেন্ট কাগজে লেখা হাদীস বের করে দেখাতেন, পড়ে শোনাতেন। আনাসের (রা) সংগ্রহে ছিল ২,১৮৬টি হাদীস।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) আরেকজন বুদ্ধিমান তরুণ। বয়স ১৬/১৭। জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতে নবীজীর (স) সান্নিধ্যেই দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাতেন। নবীজীর (স) অনুমতি নিয়ে তিনি সাথে সাথেই তাঁর বলা সব কথা লিখে রাখতেন।

সাহাবী আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একমাত্র আবদুল্লাহ ইবনে আমর ছাড়া আর কেউ আমার চেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করতে পারেন নি। কারণ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) সব

হাদীস সাথে সাথে লিখে ফেলতেন। তার সংগ্রহে ১০ হাজার হাদীস ছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) নবীজীর (স) সব কথা লিখে রাখার ব্যাপারে কতটা তৎপর থাকতেন তা একটি ঘটনা থেকে খুব স্পষ্ট বোঝা যায়। নবীজীর (স) ওফাতের অনেক পর এক আসরে আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে (রা) জিজ্ঞেস করা হলো, মুসলমানরা রোমানদের কোন শহর প্রথম জয় করবে? রোম না কনস্ট্যান্টিনোপোল? প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে তিনি পুরানো একটা বাক্স আনতে বললেন। বাক্স খুলে সেখান থেকে একটি বই বের করে তাতে পৃষ্ঠা উল্টে পড়া শুরু করলেন : একদিন আমরা নবীজীর (স) সান্নিধ্যে বসেছিলাম। তখন একজন প্রশ্ন করলেন, কনস্ট্যান্টিনোপোল না রোম, কোন শহর আমরা প্রথম জয় করব? নবীজী (স) জবাবে বললেন, হেরাক্লিয়াসের পুত্রের শহর (অর্থাৎ কনস্ট্যান্টিনোপোল) প্রথম জয় করব। নিঃসন্দেহে বাক্সে শুধু একটা বই-ই ছিল না। আরও বিস্ময়কর হচ্ছে—বইয়ের লেখা থেকে পাঠ করার ৭০০ বছর পর অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ কনস্ট্যান্টিনোপোল জয় করেন।

ইবনে আমরের পুত্র ও নাতিরা এই পাণ্ডুলিপির ওপর নির্ভর করে হাদীসের বিশাল জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেন। তার নাতি আমর ইবনে শুয়াইব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (র) মুহাদ্দিস হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

সাহাবীরা নবীজীর (স) উপদেশ, নির্দেশ, পরামর্শ সব

লিখে রাখার গুরুত্ব সবসময়ই অনুভব করেছেন। কারণ তারা সব ব্যাপারেই তাঁর নির্দেশ অনুসরণে আন্তরিক ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) ৫০০ হাদীসের একটি সংকলন তৈরি করে কন্যা আয়েশার (রা) হেফাজতে রাখেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নিখুঁত অনুসারী। সংকলন করার পর তার মনে হলো সব হাদীস তো নিজে শোনেন নি। অন্য সাহাবীরা শুনেছেন এমন হাদীসও রয়েছে। তাদের কেউ যদি কোথাও কোনো ভুল করে থাকে? এ সংশয় থেকে তিনি লেখা কাগজগুলো পানিতে ধুয়ে ফেলেন।

নবীজীর (স) ওফাতের পর সাহাবীদের মধ্যে আবু হুরায়রা, সামুরাহ ইবনে জুন্দুব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সাদ ইবনে উবাদা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আলী ইবনে আবু তালিব, জাফর ইবনে নামতুর আর রুমীসহ ৫০ জনেরও বেশি সাহাবী হাদীসের লিখিত সংকলন তৈরি করেন—যা 'সহিফা' নামে পরিচিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর ছাত্র প্রখ্যাত তাবেঈন সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা) তাদের দুজনের কাছ থেকে শোনা হাদীসের লিখিত সংকলন তৈরি করেন। হাদীস লিখে ফেলাকে তাবেঈরা তাদের বিশেষ দায়িত্ব বলেই মনে করতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) প্রথম সারির হাদীস বর্ণনাকারী। তার মুক্ত দাস নাফি (র) তার বর্ণিত হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন। পাক্কা ৩০ বছর নাফি এই লিপিবদ্ধকরণের কাজ করেছেন। নাফিকে তিনি আল্লাহর এক আশীর্বাদ

হিসেবে মনে করতেন। ইবনে ওমরের (রা) ব্যক্তিগত পাঠাগারে তার বাবা ওমর ইবনে খাত্তাবসহ অনেকের লিখিত দলিল-দস্তাবেজ ছিল। এ থেকে তিনি তার ছাত্রদের কপি করার নির্দেশ দিতেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২,৬৩০।

হাদীসের জ্ঞানের আরেক আধার আলী ইবনে আবু তালিব (রা)। নবীজী (স) তার সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি জ্ঞানের নগরী হলে, আলী হচ্ছে তার প্রবেশপথ'। তার কাছেও নবীজীর অনেক আদেশ নিষেধের লিখিত কপি ছিল যা তিনি সংরক্ষণ করতেন। অন্যদের লিখে নিতে বলতেন। তিনি খলিফা থাকার সময়ও একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, কে আছ এক দিরহামের বিনিময়ে জ্ঞান নিতে চাও? একজন উঠে গিয়ে বাজার থেকে এক দিরহাম দিয়ে কাগজ কিনে আনলেন। আলী (রা) সেই কাগজে হাদীস লিখে দিলেন।

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা (রা)। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫,৩৭৪ বা তার বেশি। জন্মস্থান ইয়েমেন। ৭ম হিজরিতে মদিনায় এসে নবীজীর (স) কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি যেমন মেধাবী ছিলেন, তেমন ছিল জানার আগ্রহ। আরবি ছাড়াও তিনি ফারসি ও আবিসিনিয় ভাষা জানতেন। মদিনায় মসজিদের চত্বরেই পড়ে থাকতেন। নবীজীর (স) সঙ্গ পাওয়া যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ কোথাও যেতেন না। এমনকি খাবার সংগ্রহের জন্যেও না। বলা যায় তিনি যথার্থই উপোস করতে পারতেন।

অল্প সময়ে এত বেশি সংখ্যক হাদীস আয়ত্ত করতে পারার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, যখন মোহাজির ভাইরা

ব্যবসায়ে সময় দিতেন, আনসাররা সময় দিতেন বাগান বা খামারে, আমি তখন ক্ষুধা নিবারণে সময় না দিয়ে পড়ে থাকতাম নবীজীর কাছে। তাঁর প্রতিটি কথা প্রথমে স্মৃতিতে তারপর সুযোগমতো লিখে রাখতাম।

তার স্মৃতি পরীক্ষা করার জন্যে মদিনার গভর্নর মারওয়ান ইবনে আল হাকাম নিজ দফতরে তাকে আমন্ত্রণ জানান। অন্যান্য আলাপ-আলোচনার পর হাদীস নিয়ে প্রশ্ন করেন। আবু হুরায়রার (রা) সমস্ত কথা পর্দার অন্তরালে থাকা কাতিব সাথে সাথে লিখে ফেলেন।

একবছর পর আবার গভর্নর তাকে আমন্ত্রণ জানান, এবারও অন্য আলাপের পর একই হাদীসের প্রসঙ্গ তোলেন। পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকা কাতিব বিস্ময়ের সাথে দেখেন যে, একটি শব্দেরও কোনো নড়চড় হয় নি! একটি শব্দও কম বলেন নি, একটি শব্দও বেশি বলেন নি।

আবু হুরায়রার (রা) বৃদ্ধ বয়সের ঘটনা। আল হাসান ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া আল দামরী বলেন, একদিন আমি একটি হাদীস সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাইলাম। তিনি এ ব্যাপারে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, আমি আপনার কাছ থেকে শুনেছি। তিনি রাগত স্বরে বললেন, তুমি যদি আমার কাছ থেকে শুনে থাকো, তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে লেখা আছে।

তিনি আমার হাত ধরে ফেললেন। নিয়ে চললেন তার ঘরে। সেখানে হাদীসের অনেকগুলো বই ছিল। আলোচ্য হাদীসটি খুঁজে বের করলেন। আনন্দমিশ্রিত বিস্ময় প্রকাশ

করে বললেন, ‘বলেছিলাম না! যদি আমি হাদীসটি বলে থাকি তবে অবশ্যই তা আমার কাছে লেখা আছে। এই দেখ!’ ৮০০-এর বেশি সাহাবী, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনরা আবু হুরায়রার (রা) বর্ণিত হাদীসের বাহক ছিলেন।

উম্মুল মোমেনিন আয়েশা (রা)। প্রথম পাঁচ জন হাদিসবেত্তার একজন। নবীজীর ওফাতের পরও প্রায় ৫০ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। হাদীস বর্ণনা ও নির্ভীক স্পষ্টভাষণের জন্যে সর্বজন শ্রদ্ধেয়া। তার প্রধান ছাত্র ছিলেন আমারাহ (র)। তিনি আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেন।

৯৯ হিজরিতে খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজের সময় আমারাহ (র)-এর ভাতিজা মদিনার প্রধান বিচারপতি আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ এই সংকলনের ভিত্তিতে হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। খলিফার নির্দেশে এই গ্রন্থ কপি করে মুসলিম শাসনাধীন বড় বড় শহরে প্রেরণ করা হয়।

বলা যেতে পারে, গ্রন্থ আকারে হাদীস প্রকাশ ও প্রচারের এটাই প্রথম ব্যাপক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। এই উদ্যোগের জন্যে ইতিহাসে দ্বিতীয় ওমর নামে পরিচিত নীতিনিষ্ঠ খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

খলিফা দ্বিতীয় ওমর আরো যাদের হাদীস সংকলনের নির্দেশ পাঠান, তাদের মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইমাম মুহম্মদ ইবনে মুসলিম আজজুহুরি। ফলে ইমাম জুহুরির কালে নতুন উদ্দীপনায় হাদীস সংকলিত হতে শুরু করে। এ সময়ের মুহাদ্দিসদের মধ্যে ইবনে জুরায়েজ, ইবনে ইসহাক, সুফিয়ান

আস সাওরী, মামার, ইবনুল মুবারক প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হিজরি দ্বিতীয় শতকে হাদীস নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন ইমাম মালিক ইবনে আনাস। তার সংকলন *আল মুয়াত্তা* হাজার বছর পরেও হাদীসের আকরগ্রন্থ হিসেবে বিরাজ করছে। ইমাম মালিক ছিলেন যথার্থই নবীপ্রেমিক। মদিনায় নবীজীর (স) দেহ মুবারক শায়িত আছে। তাই তিনি কখনোই মদিনায় কোনো বাহনে উঠতেন না।

তবে ন্যায়নিষ্ঠ ইমামদের অধিকাংশই শাসকদের রোষানল থেকে রক্ষা পান নি। ইমাম মালিকও রোষানলে পড়েন। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে মদিনার তখনকার গভর্নর তাকে বিবস্ত্র করে ৭০টি বেত্রাঘাত করে।

হিজরি দ্বিতীয় শতকে সংকলিত হাদীস গ্রন্থের মধ্যে ইমাম শাফির—'মুসনাদ', ইমাম আবদুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম আল সময়ানীর 'আল জামি', শুবাহ ইবনুল হাজ্জাজের 'মুসান্নাফ', সুফিয়ান ইবনে উহায়নাহর 'মুসান্নাফ', লায়স ইবনে সাদের 'মুসান্নাফ' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

হিজরি তৃতীয় ও চতুর্থ শতক হাদীস বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ বিকাশের যুগ। হাদীস গ্রন্থাকারে সংকলন করার আগে বর্ণনাকারীদের জীবন ও জীবনাচারও বিশ্লেষিত হতে থাকে ব্যাপকভাবে। অতীত নিয়ে কোনো গবেষণাকর্মে তথ্যের সত্যাসত্য যাচাইয়ের এত কঠোর প্রক্রিয়া আগে বা পরে কখনো অনুসৃত হয় নি। হাজার হাজার মুহাদ্দিসের নিরলস পরিশ্রমের ফসল এই দুই শতকের হাদীস গ্রন্থমালা।

এ সময়ের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংকলন হচ্ছে : ইমাম আবু দাউদের আস সুনান, ইমাম নাসাঈ-র আস সুনান, ইমাম তিরমিজীর আল-জামী, ইমাম ইবনে মাজাহ-র আস সুনান, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মুসনাদ, ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ-র মুসান্নাফ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত তাবারী-র কিতাবু তাহযীবিল আসার, ইমাম আল কুরতুবীর আল মুসনাদুল কবীর, ইমাম দারিমীর মুসনাদ, ইমাম আবু ইয়ালা আল মুসিলীর মুসনাদ, ইমাম আশ শায়বানীর মুসনাদ, ইমাম আবু বকর আল বাজ্জার-এর আল মুসনাদুল মুআল্লাম, ইমাম ইবনে শায়বাহ-র আল মুসনাদুল কবীর, ইমাম তাবারানী-র আল মুজামুল কবীর, ইমাম দারাকুতনী-র সুনান, ইমাম ইবনে হিব্বান আল বাসতী-র সহীহ, ইমাম ইবনে ইসহাকের সহীহ।

হিজরি তৃতীয় শতকে হাদীসের সবচেয়ে কালজয়ী কাজ করেছেন ইমাম বোখারী ও তাঁর ছাত্র ইমাম মুসলিম। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ নামে পরিচিত হাদীস গ্রন্থদ্বয় স্থান পেয়েছে ঘরে ঘরে। ইমাম বোখারীর আর একটি কালজয়ী কাজ হচ্ছে 'আল আদাবুল মুফরাদ'। নবী জীবনে শুদ্ধাচারের অনন্য বিবরণ হচ্ছে এই মুফরাদ—হাদীস সংকলন।

এরপর হাজার বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞানের তৃষ্ণা পাশ্চাত্য প্রাচ্য সবখানেই বেড়েছে। বরং বলা যায়, ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

সাধারণভাবে আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, নবীজীর ওফাতের পরও তাঁর বাণী ও তাঁর জীবনাচার জানার ব্যাপারে

বিশ্বাসীদের মধ্যে এত আগ্রহ কেন? কারণ একটাই—তাঁর বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর বাণীর চির আধুনিকত্ব।

তাঁর বাণী ও জীবনাচারের মাধ্যমে তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন কীভাবে নিজেকে ভালো রাখতে হবে, কীভাবে দেহের যত্ন নিতে হবে, শারীরিক সুস্থতার জন্যে কী কী করতে হবে। মনের আবর্জনা দূর করতে করণীয় কী তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে তাঁর বাণীতে। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সাথে, প্রতিবেশী-অধীনস্থের সাথে কীভাবে সদাচরণ করতে হবে, কোন আচরণ বর্জনীয় এবং কোন আচরণ অনুসরণীয় তার বিস্তারিত বিবরণ আছে এখানে। শুধু যুদ্ধ-সংঘাতে নয়, শান্তি ও বিজয়ে সমাজে রাষ্ট্রে করণীয়-বর্জনীয়ের সুস্পষ্ট গাইডলাইন রয়েছে তাঁর নির্দেশনায়, তাঁর হাদীসে।

আর যারা নিজেকে আল্লাহতে পুরোপুরি সমর্পিত করতে চান, তারাও হাদীসে পাবেন সহজ পথের দিশা। শুধু জীবনকে নয়, মৃত্যুকেও কীভাবে সম্মানিত মহিমান্বিত করা যায়, তারও পথ-নির্দেশ দিয়ে গেছেন তিনি।

সবচেয়ে ব্যতিক্রমী হচ্ছে, নবীজী (স) যা বলেছেন, নিজের জীবনাচারে তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এজন্যেই শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে এই সহস্রাব্দেও হাদীসের প্রতি মানুষের এত আগ্রহ। ইমাম বোখারীসহ শত শত মুহাদ্দিসের হাদীস সংকলন মানুষের এই আগ্রহ পূরণের কাজটাকেই সহজ করেছে।

‘হাদীস পাঠ’ মূলত মহানবীর (স) শিক্ষা ও জীবনাচারেরই আলোচনা। এই আলোচনার কোথাও যদি নিজের অজ্ঞাতসারে কোনো ভুল হয়ে থাকে, এজন্যে পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

এ হাদীস পাঠ করে যদি একজন মানুষও সত্যের সন্ধান পান, হাদীসের জ্ঞান অর্জনে ও আত্মস্থ করতে উৎসাহী হন, তাহলে এর সমস্ত সওয়াবের আসল হকদার হচ্ছেন এর গ্রন্থনা, প্রকাশনা, পরিবেশনা ও বিতরণে নিবেদিত আমাদের নেপথ্য সহযোদ্ধারা। আল্লাহ আমাদের কাজকে বহমান সৎকর্ম হিসেবে কবুল করুন।

জ্ঞান

জ্ঞান তোমাদের হারানো ধন, যেখানে পাও সেখান থেকেই কুড়িয়ে নাও।

—*আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী, মেশকাত*

রাতে একঘণ্টা জ্ঞানচর্চা বা ধ্যান সারারাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

—*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); মেশকাত*

যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্যে ঘর থেকে বের হয়, সে ঘরে না ফেরা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জেহাদের মধ্যে) থাকে।

—*আনাস ইবনে মালেক (রা); তিরমিজী*

তোমরা আল্লাহর কাছে তোমার জন্যে কল্যাণকর জ্ঞান প্রার্থনা করো। আর কল্যাণহীন জ্ঞান থেকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করো।

—*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); ইবনে মাজাহ*

মগ্নপাঠ

প্রত্যেক নরনারীর জন্যে জ্ঞান অর্জনকে নবীজী (স) ফরজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, জ্ঞানচর্চাকে তিনি কত গুরুত্ব দিয়েছেন! আর জ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক জ্ঞান হচ্ছে সঠিক জীবনদৃষ্টির জ্ঞান। কারণ ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি, ভ্রান্তজ্ঞান বা অবিদ্যা—এটাই মানুষের দুঃখের কারণ।

সকল মহামানবই সত্যজ্ঞানের আলোয় মানুষকে আলোকিত করার জন্যে পৃথিবীতে এসেছিলেন। তারা অবিদ্যাকে দুঃখের মূল কারণ হিসেবে শনাক্ত করেছেন এবং সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আগে অবিদ্যা দূর করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কেননা অবিদ্যা দূর হয় জ্ঞানের আলোয়। যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা যত নবী-রসুল পাঠিয়েছেন, তারা মানুষকে সত্যজ্ঞানের আলোয় আলোকিত করার জন্যে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

রসুলুল্লাহ (স) সত্যজ্ঞান লাভ করার পর থেকেই জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন সেই জ্ঞানের আলোয় মানুষকে আলোকিত করার জন্যে। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করো এবং জ্ঞান বিতরণ করো। এটাই সর্বোত্তম কাজ। জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিতরণে যার জীবন উৎসর্গিত সে শহিদ, সে অমর।

রসুলুল্লাহর পরে তাঁর সহযোদ্ধা অর্থাৎ তাঁর সাহাবীরা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন জ্ঞান অর্জন, জ্ঞানচর্চা এবং জ্ঞান বিতরণে। নবীজীর (স) ওফাতের পর সাহাবীরা দলে দলে

দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন জ্ঞান অর্জন, চর্চা ও জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে। সাহাবীদের শতকরা ৯০ শতাংশ মৃত্যুবরণ করেন জন্মভূমি থেকে বহুদূরে। আটলান্টিকের তীর থেকে শুরু করে চীন পর্যন্ত, মাঝখানে কায়রো আলেকজান্দ্রিয়া আবিসিনিয়া দামেশক ফিলিস্তিন কুফা বসরা বাগদাদ ওমান ইয়েমেন কনস্ট্যান্টিনোপোল (ইস্তাম্বুল) আর্মেনিয়া কাবুল খোরাসান সমরখন্দ বোখারা কাশগর মালাবার শ্রীলংকা বাংলা মালয় ইন্দোনেশিয়া—কোথায় যান নি তারা! তাদের পায়ের ছাপ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

নবীজীর (স) বাণী নিয়ে যে-সব সাহাবী চীনে গিয়েছিলেন তারা বাংলা হয়ে চীনে যান। তখন চীনের সাথে বাংলার বাণিজ্যপথ বিস্তৃত ছিল চট্টগ্রাম থেকে লালমনিরহাট হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে। এই পথটি ছিল সবচেয়ে প্রাচীন সিল্করুটের অংশ। ধারণা করা হয়, ৬৯ হিজরিতে লালমনিরহাটে তারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। আর এই পথে সাহাবী, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনরা চীনে গিয়েছিলেন। তাদের অনেকের মাজার এখনো চীনে রয়েছে।

হাদীসের সত্যজ্ঞান সুরক্ষায় আসহাবে সুফফার সাহাবীরা অনাহারে-অর্ধাহারে থেকেও অক্লান্ত মেহনত করেছেন। যখন মদিনায় প্রাচুর্য এসেছে তখনো সাহাবীরা সত্যজ্ঞান সংরক্ষণের জন্যে কোনো কষ্ট করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি।

নবীজীর (স) ঘনিষ্ঠ সহচরদের একজন ছিলেন আবু আইয়ুব আনসারী (রা)। একবার আবু আইয়ুব (রা) মদিনা থেকে মিশর গেলেন। তার আসার কথা শুনে মিশরের

তখনকার গভর্নর মাসলামা ইবনে মাখলাদ নিজেই তাকে স্বাগত জানালেন এবং জানতে চাইলেন কীভাবে তিনি সাহায্য করতে পারেন। আবু আইয়ুব (রা) সরাসরি বললেন, আমি এসেছি উকবা ইবনে আমিরের (রা) সাথে দেখা করতে। একটা হাদীসের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই। হাদীসটি রসুলুল্লাহর (স) কাছ থেকে সরাসরি যারা শুনেছে, তাদের মধ্যে কেবল উকবা এবং আমি—এই দুজনই বেঁচে আছি।

গভর্নর একজন কর্মচারীকে সাথে দিয়ে দিলেন। তাকে উকবা ইবনে আমিরের (রা) বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আবু আইয়ুব (রা) উকবাকে (রা) বললেন, অন্যের দোষ গোপন রাখার ব্যাপারে একটি হাদীস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আমি আপনার কাছে এসেছি।

উকবা ইবনে আমির (রা) বললেন, হাঁ। আমি রসুলুল্লাহকে (স) বলতে শুনেছি, কারো চরিত্রের কোনো দোষ দেখে কেউ যদি তা গোপন রাখে, তবে সে একজন জীবন্ত কবর দেয়া কন্যাশিশুকে জীবিত উদ্ধার করার মতো পুণ্য অর্জন করবে। আবু আইয়ুব (রা) বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন।

আবু আইয়ুব আসলে নিশ্চিত হতে চাইছিলেন, তিনি হাদীসটি সঠিকভাবে মনে রাখতে পেরেছেন কিনা! উকবা (রা) হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করায় আবু আইয়ুব (রা) নিশ্চিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ আবার সুদূর মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা করলেন।

এ থেকে বোঝা যায় সাহাবীরা জ্ঞান হাসিল, সংরক্ষণ এবং বিতরণের জন্যে কোনো প্রকার কষ্ট স্বীকার করতে কখনো দ্বিধা করেন নি।

এ কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই নবীজী (স) বলেছেন : ৪০টি হাদীসের জ্ঞান যে আত্মস্থ ও সংরক্ষণ করবে, মহাবিচার দিবসে একজন জ্ঞানী হিসেবে তার পুনরুত্থান হবে এবং আমি তার শাফায়াতকারী হবো। (মেশকাত)

সাহাবীরা তাই নবীজীর (স) বাণী সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্যে এত মেহনত করেছেন। আমরাও যদি ৪০টি হাদীসের জ্ঞান আত্মস্থ ও সংরক্ষণ অর্থাৎ বিতরণ করি, তাহলে মহাবিচার দিবসে জ্ঞানী হিসেবে আমাদের পুনরুত্থান ঘটতে পারে শহিদের মর্যাদায়।

শুকরিয়া : প্রাচুর্যের শুরু

যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, যার কাছে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ রয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তাতেই যে পরিতৃপ্তি প্রকাশ করে তাকে অভিনন্দন। সে সফল।

—*ফাদালা ইবনে ওবায়েদ (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* তিরমিজী, মুসলিম

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। উপকৃত হয়ে যে মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে কখনো আল্লাহর শোকরগোজার বান্দা হতে পারে না।

—*আবু হুরায়রা (রা);* আবু দাউদ, আহমদ

তোমার চেয়ে বিত্তবান বা তোমার চেয়ে সুন্দর কারো দিকে না তাকিয়ে তোমার চেয়ে বিত্তহীন বা তোমার চেয়ে অসুন্দর কারো দিকে তাকাও। তাহলেই তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহকে অনুধাবন করতে পারবে।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

মগ্নপাঠ

নবীজীর (স) পুরো জীবনটাই শোকরগোজারির দৃশ্যমান রূপ। তিনি সাফল্য অর্জনের মুহূর্তে যেমন শোকরগোজার ছিলেন, যে-কোনো প্রতিকূলতায়, যে-কোনো প্রতিবন্ধকতায়, যে-কোনো চ্যালেঞ্জে অর্থাৎ সর্বাবস্থায় একইভাবে তিনি ছিলেন শোকরগোজারির দৃশ্যমান প্রতীক।

নবীজী (স) ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরেই আল্লাহর প্রশংসা করতেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। স্রষ্টার প্রতি এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অব্যাহত থাকত সারাদিন, সমস্ত ঘটনায়। এমনকি দিনশেষে রাতের গভীরে যখন নামাজে নিমগ্ন হয়ে যেতেন, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা যখন ফুলে উঠত, তখনো প্রফুল্লচিত্তে তিনি কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করতেন।

একদিন মা আয়েশা (রা) নবীজীর (স) ফোলা পা দেখে প্রশ্ন করলেন, আল্লাহ তায়ালা তো আপনার অতীতের এবং ভবিষ্যতের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তারপরও আপনি এত কষ্ট করছেন কেন! নবীজী (স) হেসে বললেন, 'এরপরও কি আমি তাঁর শোকরগোজার বান্দা হবো না?' অর্থাৎ শোকরগোজারি ছিল তাঁর জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এবং সে-কারণেই তিনি হতে পেরেছিলেন পৃথিবীর সফলতম মানুষ।

পৃথিবীকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছেন এমন শত মনীষীর তালিকা করতে গিয়ে মার্কিন জ্যোতির্পদার্থবিদ ও গবেষক মাইকেল এইচ হার্ট বাধ্য হন নবীজীকে (স) তালিকার শীর্ষে স্থান দিতে। পার্থিব এবং অপার্থিব, বৈষয়িক এবং

আধ্যাত্মিক—প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান ছিল যে কারো জন্যে অনুসরণীয়। সেজন্যেই তিনি ইতিহাসকে প্রভাবিতকারী শত ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রথম স্থানে ভূষিত হয়েছেন।

এই সাফল্যের রহস্য কী? রহস্য হলো শোকরগোজারি। শুকরিয়া হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের প্রকাশ এবং নিজের ওপর আস্থার প্রকাশ। ইতিবাচকতা ভবিষ্যৎ রচনা করে। শুকরিয়া হচ্ছে সেই ইতিবাচক শক্তির প্রকাশ। শুকরিয়া যত প্রবল হবে, ইতিবাচকতা তত প্রবল হবে। বাধা আসবে, ঝঞ্ঝাট আসবে, ঝামেলা আসবে কিন্তু শুকরিয়ার ইতিবাচকতা সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

সূরা ইব্রাহিমের ৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কারভাবে বলেছেন : 'যদি তোমরা শোকরগোজার হও, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে অনেক নেয়ামত দান করব।' আমরা স্পষ্টতই বলতে পারি, নবীজী (স) তাঁর এই শোকরগোজারির গুণ দিয়েই এত এত নেয়ামত ও অর্জনে ভূষিত হয়েছেন।

সূরা নিসার ১৪৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন, 'তোমরা যদি শোকরগোজার হও ও আন্তরিক বিশ্বাসে বলীয়ান থাকো, তবে তোমাদের অতীত ভুলের জন্যে শাস্তি দিয়ে আল্লাহর কী লাভ? আল্লাহ সবসময়ই শোকরগোজারির পুরস্কার দিয়ে থাকেন। তিনি সর্বজ্ঞ।'

আসলে পার্থিব এবং অপার্থিব, ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক—সকল অর্জনের চাবিকাঠি হচ্ছে এই শুকরিয়া। নবীজীর (স) যারা খলিফা ও সাহাবী ছিলেন, তারাও

একেকজন শোকরগোজারির উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে রয়েছেন। যেমন, উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান (রা)। শোকরগোজারির অনন্য দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেন।

তিনি ছিলেন আবু তালহার (রা) স্ত্রী। একবার আবু তালহা (রা) যখন সফরে ছিলেন তখন তাদের ১০ বছরের সন্তান আবু উমাইর অসুস্থ হয়ে মারা যায়। উম্মে সুলাইম (রা) তার পরিবারের সদস্যদের বলে রেখেছিলেন, আমি না বলা পর্যন্ত তোমরা কেউই আবু উমাইরের মৃত্যুর ব্যাপারে তার বাবাকে কিছু বলবে না।

যখন আবু তালহা (রা) ফিরে এলেন, উম্মে সুলাইম (রা) তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। আবু তালহা (রা) ছেলের ব্যাপারে যখন জিজ্ঞেস করলেন, উম্মে সুলাইম (রা) তাকে বললেন, সে খুব শান্তিতে আছে। রাতের খাবার শেষে উম্মে সুলাইম (রা) স্বামীর কাছে এলেন।

যখন উম্মে সুলাইম (রা) দেখলেন, স্বামী অত্যন্ত তৃপ্ত ও উচ্ছল অবস্থায় রয়েছেন, তখন তিনি স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, কেউ যদি কারো কাছে কোনোকিছু আমানত রাখে এবং সে যদি তা ফেরত চায়, তখন তাকে তা ফেরত দিতে কেউ কি অস্বীকৃতি জানাতে পারে? আবু তালহা (রা) বললেন, না, কখ্খনো নয়। তখন উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, আমাদের পুত্র আবু উমাইর আমাদের কাছে আল্লাহর আমানত ছিল। আল্লাহ তাকে নিয়ে গেছেন।

পুত্রের মৃত্যুতে আবু তালহা (রা) বিষণ্ন হয়ে পড়লেন এবং সাথে সাথে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন যে, এই ঘটনাটি তার স্ত্রী

তাকে আগে জানায় নি! উম্মে সুলাইম (রা) তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকলেন। শান্ত হয়ে অবশেষে তিনি বললেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কিন্তু আবু তালহা (রা) বিষয়টি নিজের ভেতরে রাখতে পারলেন না।

সকালবেলাই নবীজীর (স) কাছে হাজির হলেন এবং পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। নবীজী (স) তার স্ত্রীর প্রশংসা করলেন। তারপর দোয়া করলেন, আল্লাহ গত রাত তোমাদের জন্যে আশীর্বাদের রাত করুন।

উম্মে সুলাইম (রা) গর্ভবতী হলেন এবং একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হলো। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র আনাস ইবনে মালিকের (রা) মাধ্যমে নবজাতক পুত্রকে নবীজীর (স) কাছে পাঠালেন। নবীজী (স) একটা খেজুর চিবিয়ে সেই চিবানো খেজুর শিশুর জিহ্বায় ঘষে দিলেন এবং তার নাম রাখলেন 'আবদুল্লাহ'। আবদুল্লাহ ইবনে তালহা (রা) বড় হয়ে তার জামানার বিশিষ্ট জ্ঞানী হিসেবে খ্যাতিমান হন। আবদুল্লাহর ঔরসে জন্মগ্রহণকারী সাত ছেলেই পরবর্তীতে কোরআনে হাফেজ এবং কোরআনের জ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন, তিনি সবসময়ই শোকরগোজারির পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

শুকরিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মূল সমস্যা হচ্ছে, শুকরিয়ার মনস্তত্ত্বটা বুঝতে না পারা। আমরা যখন কারো কোনো উপকার করি, সে ধন্যবাদ না দিলে কষ্ট পাই। আবার যখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তখন আমরা তাকে আরো সহযোগিতা করার জন্যে প্রস্তুত থাকি। এটাই মানবীয় স্বভাব।

আমরা বুঝি না যে, আল্লাহও এই শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতার প্রকাশ দেখতে চান। করুণাময় যে অনুগ্রহ সম্পদ দিয়েছেন, অধিকাংশ মানুষ এটাকে তার জন্মগত অধিকার মনে করে। স্বাভাবিক প্রাপ্তি হিসেবে ধরে নেয়।

আপনি যদি কাউকে বলেন, আল্লাহ যে তোমাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, শ্রবণশক্তি দিয়েছেন এবং আরো বিভিন্ন গুণ দিয়েছেন, এজন্যে তোমার আল্লাহকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত, আল্লাহর শোকরগোজার হওয়া উচিত। সে বিস্মিত হয়ে আপনার দিকে তাকাবে। তার অব্যক্ত প্রশ্নটি হচ্ছে—কী বলছ! এটা তো আমার এমনিই পাওয়ার কথা। কিন্তু একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী জানে, দৃষ্টিশক্তি কত বড় নেয়ামত! একজন শ্রবণপ্রতিবন্ধী উপলব্ধি করে, শ্রবণশক্তি কত বড় নেয়ামত! একজন বিকলাঙ্গ বুঝতে পারে, হাত-পা সচল থাকা কত বড় নেয়ামত।

অধিকাংশ মানুষ যে কৃতজ্ঞ হতে পারে না, ইতিবাচক হতে পারে না, এর প্রধান কারণ হচ্ছে ছোটবেলা থেকে বড় হতে গিয়ে যা পেয়েছে, তারা সেটাকে প্রাপ্য মনে করে। তারা ভাবে, এর জন্যে কাউকে ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নাই। মা-কে ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নাই, বাবাকে ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নাই, আত্মীয়দের ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নাই।

অধিকাংশ মানুষ মনে করে, তার প্রিয়জনরা তার জন্যে যা করেছে, সেটা তো তাদের কর্তব্য। এমনটা ভাবার কারণে সে কাউকে ধন্যবাদ দিতে শেখে না। তাই আল্লাহর কাছেও শুকরিয়া প্রকাশ করতে পারে না। নবীজী (স) খুব

পরিষ্কারভাবে বলেছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। উপকৃত হয়ে যে মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে কখনো আল্লাহর শোকরগোজার বান্দা হতে পারে না।

আসলে যখন আমরা মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তখন প্রকারান্তরে আল্লাহর কাছেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তাই যার কাছ থেকে যত ছোট উপকারই পেয়েছেন, সেটার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানান। আল্লাহর রসুলের নির্দেশ অনুসারে উপকৃত হওয়ার সাথে সাথেই বলুন 'জাযাকাল্লাহু খায়রান' অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

উসামা ইবনে জায়েদ (রা) বর্ণিত হাদীস—নবীজী (স) বলেছেন, কেউ অন্যের দ্বারা উপকৃত হলে উপকারীকে যেন বলে 'জাযাকাল্লাহু খায়রান' বা আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

এই দোয়া উপকৃতের তরফ থেকে উপকারকারীর উপকারের উত্তম প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সূচনা হোক ঘর থেকে, আত্মীয় থেকে, বন্ধুবান্ধব থেকে, আপনজন থেকে। পরিবারে 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' বলার চর্চা করুন। সকল প্রশংসা আল্লাহর, সকল কৃতজ্ঞতা আল্লাহর।

যে-কোনো পরিস্থিতিতে যত 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' বলতে পারবেন, তত আপনার মধ্যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং নিজের ওপর বিশ্বাস বাড়বে। তত আপনার ভেতরে ইতিবাচকতা বাড়বে। তত আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পদ আল্লাহর নেয়ামত আপনার ওপর বর্ষিত হতে থাকবে। তত আপনি সফল হবেন ইহকাল এবং পরকালে।

সালাম : রহমত ও বরকতের উৎস

'আসসালামু আলাইকুম' বলে সবাইকে আগে সালাম দাও।

—*আবু উমামা (রা);* মেশকাত, আবু দাউদ

যখন তুমি ঘরে ফেরো, তখন ঘরের সবাইকে সালাম দাও। সালাম তোমার ও তোমার পরিবারের কল্যাণ ও বরকতের উৎসে পরিণত হবে।

—*আনাস ইবনে মালেক (রা);* তিরমিজী

যে আল্লাহর নিকটবর্তী, সে-ই সবসময় অন্যকে সালাম দেয়ার ক্ষেত্রে হয় অগ্রবর্তী।

—*আবু উমামা (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

হে মানুষ! পরস্পরকে সালাম দেয়ার রেওয়াজ চালু করো। অভুক্তদের খাবার দাও। আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করো। সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামাজে নিমগ্ন হও। তুমি নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

—*আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা), আনাস (রা);* তিরমিজী

মগ্নপাঠ

একজন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষও যদি মনোযোগ দিয়ে শোনেন, আসসালামু আলাইকুম অর্থাৎ আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক—এই বাণীর স্মার্টনেস ও চির আধুনিকতায় তিনি বিস্মিত হবেন।

কারো সাথে দেখা হলে আপনি যখন 'আসসালামু আলাইকুম' বলছেন, আপনি আসলে তার শান্তি কামনা করছেন। আর সারা পৃথিবীতে এখন এই শান্তিরই অভাব সবচেয়ে বেশি। হিংসা ঈর্ষা ও ঘৃণার বিস্তার ঘটেছে মূলত পারস্পরিক শান্তি কামনার অভাব থেকে। কারো সাথে দেখা হলে আন্তরিকভাবে তার শান্তি কামনা করাকে আমরা যদি বিশ্ব সংস্কৃতির অংশে পরিণত করতে পারি, তাহলে এই শুভকামনা হিংসার বিলুপ্তি ঘটাতে পারে।

নবীজী (স) এই সম্ভাবনা দেখেই বলেছেন, সর্বত্র সালামের প্রচলন করো। অর্থাৎ প্রথম সুযোগেই আগে সালাম দাও। তোমরা লাভ করবে শান্তি ও নিরাপত্তা। (আহমদ, মুফরাদ) তিনি বার বার সবাইকে আগে সালাম দেয়ার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনিও ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে আগে সালাম দিতেন।

সালাম কখন দিতে হবে, কীভাবে দিতে হবে, ঘরে কীভাবে দিতে হবে, মজলিসে কীভাবে দিতে হবে, পথে চলাচলের সময় কীভাবে দিতে হবে তার সবকিছুই *হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী*-র সালাম অধ্যায়ে রয়েছে।

নবীজী (স) বলেছেন, সালাম পূর্ণতা পায় হাত মেলানো বা করমর্দনের মাধ্যমে। (বায়হাকি, তিরমিজী)

'আসসালামু আলাইকুম' এর জবাবে কমপক্ষে বলতে হবে ওয়া আলাইকুম আসসালাম (আপনার ওপরেও শান্তি বর্ষিত হোক)। সালামের পরিপূর্ণ জবাব না দেয়াটাকে নবীজী (স) 'কৃপণতা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ সালামের পরিপূর্ণ জবাব যে দেয় না, সে আসলে কৃপণ।

সালামকে নবীজী (স) ইসলামের সর্বোত্তম কাজ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া মুসলমানদের একে অপরের প্রতি অধিকার হচ্ছে এই সালাম এবং সালামের জবাব। বোখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে উল্লেখিত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, একজন মুসলমানের প্রতি আরেক মুসলমানের পাঁচটি অধিকার আছে। প্রথমটিই হলো সুন্দরভাবে সুস্পষ্টভাবে সালামের জবাব দেয়া।

নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশের জন্যে কয়েকটি আমলের কথা নবীজী (স) বলেছেন। তার মধ্যে প্রথম আমলটি হচ্ছে, পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সবাইকে আগে সালাম দেয়া। এ থেকে বোঝা যায় যে, অন্য যে-কোনো আমলের চেয়ে সবাইকে আগে সালাম দেয়া অতি উত্তম আমল।

কেন উত্তম আমল? সেটাও আরেকটি হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, 'বিশ্বাসী ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে ভাল না বাসলে কখনো বিশ্বাসী হতে পারবে না। আর পরস্পরকে ভালবাসতে হলে পরস্পর সালাম দেয়ার রেওয়াজ চালু করো।' (মুসলিম)

অর্থাৎ সালাম দেয়ার অভ্যাস যদি আপনি গড়ে তুলতে না পারেন, আপনি কখনো বিশ্বাসী হতে পারবেন না। আর কোরআনের শিক্ষা অনুসারে সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। সূরা নিসা-র ৮৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কেউ যখন তোমাদের সালাম দেয়, তখন তোমরা কমপক্ষে সে-রকম অথবা তার চেয়েও বেশি সম্মানসহকারে সালামের জবাব দেবে।'

সালাম দেয়ার আদব কী হবে—এটাও নবীজী (স) তাঁর দৈনন্দিন সালাম চর্চার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন। তিনি সবসময় স্পষ্টভাবে স্বাভাবিক কণ্ঠে সালাম দিতেন। উচ্চস্বরে নয়। সাহাবী মিকদাদ (রা) আসহাবে সুফফার একজন। তিনি বলেছেন, নবীজী (স) সুফফা অর্থাৎ এই চত্ত্বর এলাকা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করার সময় সেখানে অবস্থানরত সাহাবীদের এমনভাবে সালাম দিতেন যে, যারা ঘুমিয়ে থাকত, তাদের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটত না। আর যারা জেগে থাকত তারা সবাই স্পষ্টভাবে সালাম শুনতে পেত।

আবার কারো বাড়ির সামনে গিয়ে খট খট আওয়াজ করে 'বাড়িতে কেউ আছেন' বলে ডাকাডাকি করার চেয়ে সালাম দেয়া অনেক বেশি শোভন ও পরিশীলিত আচরণ। বাড়ির দরজার সামনে তিন বার 'আসসালামু আলাইকুম' বলার পরও যদি জবাব না আসে, বুঝতে হবে সেই বাড়িতে কেউ নেই অথবা আপনাকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলো না।

সূরা নূর-এর ২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'অন্যের বাড়িতে প্রবেশ করার আগে তাদের সালাম জানাও

এবং অনুমতি নাও। এই নিয়ম তোমাদের জন্যে কল্যাণকর।'

কে কাকে সালাম দেবে তারও নিয়ম আছে। সাধারণ নিয়ম হলো, ছোটরা বড়দের আগে সালাম দেবে। তবে নবীজী (স) সবসময় শিশু-কিশোরদের আগে সালাম দিতেন যাতে তারা সালাম চর্চায় অভ্যস্ত হয়। আর জান্নাতে যারা প্রবেশ করবে সেখানেও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিশ্বাসীদের অভ্যর্থনা জানানো হবে সালাম সম্ভাষণের মাধ্যমে।

নবীজীর (স) শিক্ষা অনুযায়ী সাহাবী ও তাবেঈগণ সমাজে সালামের প্রসার ঘটানোর ব্যাপারে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতেন। কারণ তারা জানতেন, সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তাবোধ বাড়াতে হলে সালাম চর্চা জারি রাখতে হবে।

প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের (রা) জীবনের একটি ঘটনা। তিনি প্রায়ই বাজারে যেতেন। সঙ্গে অন্যান্য সাহাবী ও তাবেঈগণ থাকতেন। বাজারে ঢুকে একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত যতজনের সাথে দেখা হতো সবাইকে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) সালাম দিতেন। তার সঙ্গীরা ব্যাপারটা খেয়াল করল।

কয়েকদিন পর সঙ্গীদের একজন সাহস করে তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি বাজারে গিয়ে কিছু কেনেন না, বিক্রি করেন না। বাজারের কোনো মজলিসে বসেনও না। তাহলে বাজারে গিয়ে লাভ কী? আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বললেন, ওহে! সকালবেলা আমরা বাজারে যাই কেবল একটি কারণে। সেটি হলো, মানুষকে যেন বলতে পারি 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণিত হাদীস : ইসলামে সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে, পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সবাইকে আগে সালাম দেয়া (‘আসসালামু আলাইকুম' বলা) এবং অভুক্ত মানুষকে খাওয়ানো। (বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ)

১৪ শতকের মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে রজব (র) তার প্রসিদ্ধ কিতাব *আল ফাতহ*-তে লিখেছেন : অভুক্তকে খাওয়ানো ও সালামের প্রসারকে একত্রে হাদীসে উল্লেখ করার কারণ হলো, সালামের মধ্যে ভালো কথা ও আমলের মিশেল ঘটেছে যা উত্তম ইহসান। আসলে ফরজ কর্তব্যের পর এটাই ইসলামের সর্বোত্তম কাজ।

প্রিয় সুহৃদ, নিজের পারিবারিক পরিমণ্ডলে শান্তির ফল্গুধারা বইয়ে দেয়ার জন্যে যখনই ঘরে ফিরে আসুন, ছেলেমেয়ে/ স্ত্রী/ স্বামী, যে-ই দরজা খুলে দিচ্ছে, তাকে আগে সালাম দিন। ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে সালাম চর্চায় উৎসাহিত করুন নিজে আগে তাকে সালাম দেয়ার মাধ্যমে।

যত আমরা সালামের সার্বজনীন প্রচলন করব, পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সালাম দেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলব এবং কেউ সালাম দিলে ‘ওয়া আলাইকুম আসসালাম’ অর্থাৎ আপনার ওপরেও শান্তি বর্ষিত হোক—এটা সুস্পষ্টভাবে বলব, তত আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তির ফল্গুধারা প্রবহমান হবে। কল্যাণের পাশাপাশি মিলবে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, অনিশ্চয়তা ও নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি।

নিয়ত : সকল কর্মের অঙ্কুর

নিয়ত সকল কর্মের অঙ্কুর। প্রত্যেকের কর্মের মূল্যায়ন করা হবে তার নিয়ত বা অভিপ্রায় অনুসারে। কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সন্তুষ্টির জন্যে হিজরত করে, তবে সে সেভাবেই মূল্যায়িত হবে। আর যদি কেউ পার্থিব ধনসম্পত্তি বা কোনো নারীকে পাওয়ার জন্যে হিজরত করে, তবে তার মূল্যায়নও সেভাবেই হবে।

[হিজরত অর্থ দেশত্যাগ। দেশত্যাগী বা শরণার্থীর জীবনে কষ্ট অনেক। অর্থাৎ দুনিয়া হোক বা আখেরাত, একজন মানুষ যে উদ্দেশ্যে কষ্টস্বীকার করছে, মূল্যায়নটা হবে সেভাবেই। কষ্ট করার উদ্দেশ্যটাই গুরুত্বপূর্ণ। উম্মে কায়েস নামে এক কুমারীকে বিয়ে করার জন্যে মক্কা থেকে এক যুবক মদিনায় এলে নবীজী (স) একথা বলেন।]

—*ওমর ইবনে খাত্তাব (রা);* বোখারী, মুসলিম

মগ্নপাঠ

এটি বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের প্রথম হাদীস। নবীজী (স) খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, তোমাদের কর্মের মূল্যায়ন করা হবে তোমার নিয়ত বা অভিপ্রায় অনুসারে।

আপনি কী কাজ করেছেন তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কী উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটি করেছেন, কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কাজটি করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে কাজটি ভালো মনে হলেও নিয়তের কারণে মূল্যায়ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন, আপনি ব্যায়াম করছেন। শরীরচর্চা করছেন। কঠোর ডায়েট অনুসরণ করছেন। উদ্দেশ্য হলো দীর্ঘদিন কর্মক্ষম থাকা যাতে আপনি অনেক কাজ করতে পারেন, অনেক উপার্জন করতে পারেন এবং অনেক পেশাগত সাফল্য অর্জন করতে পারেন।

কিংবা রুপালি পর্দায় বা সোশ্যাল মিডিয়ার ভার্চুয়াল জগতে নিজেকে আকর্ষণীয় হিসেবে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যেও আপনি শরীরচর্চা করতে পারেন, ডায়েট করতে পারেন। আবার একাগ্রভাবে স্রষ্টার উপাসনা করা এবং সবচেয়ে ভালোভাবে সৃষ্টির সেবা করার উদ্দেশ্যে নিজেকে সুস্থ রাখতে আপনি শরীরচর্চা এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন।

তিনটি ক্ষেত্রেই আপনি শরীরচর্চা এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করছেন। কিন্তু স্রষ্টার কাছে আপনার মূল্যায়ন হবে আপনার অভিপ্রায় অনুসারে, আপনার নিয়ত অনুসারে যে, এই শরীরচর্চা এবং খাদ্যাভ্যাস কোন লক্ষ্যে

আপনি করছেন। স্রষ্টা সেই অনুযায়ীই মূল্যায়ন করবেন এবং যার যা পুরস্কার বা তিরস্কার সেটা তাকে দেবেন।

আপনার কেনাকাটার ক্ষেত্রেও এই নিয়তটি গুরুত্বপূর্ণ। আপনি একটি স্মার্টফোন দুটো উদ্দেশ্যে কিনতে পারেন। এক, ফুটানি বা বিনোদনের জন্যে। আবার আপনি স্মার্টফোনটি কিনতে পারেন অনলাইন থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে করার উদ্দেশ্যে। এ-ক্ষেত্রে আপনার অভিপ্রায় অনুসারেই আপনার কর্মের মূল্যায়ন হবে।

যখন কেউ লোক-দেখানোর জন্যে মসজিদে দান করে বা মানুষজন তাকে দাতা বলুক, সেই উদ্দেশ্যে এতিমখানায় দান করে, সেই দান আর স্রষ্টার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদে বা এতিমদের লালনে দান—দুটো কখনো এক কাতারে পড়বে না। লোক-দেখানোর জন্যে করা যে কাজ, সেটার পুরস্কার যা দেয়ার স্রষ্টা পৃথিবীতেই দেবেন। আর তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে যে দান, সেই দানের পুরস্কার স্রষ্টা দুনিয়া এবং আখেরাত দুই জায়গায়ই তাঁর ইচ্ছেমতো দেবেন।

নামাজের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইভাবে প্রযোজ্য। আপনি যদি শুধু ফরজ পালনের জন্যে একঘেয়েমি মনোভাব নিয়ে একটা ক্লান্তিকর রুটিন অনুসরণের জন্যে নামাজ পড়েন, সেটার মূল্যায়ন একরকম। আবার যখন আন্তরিকভাবেই আল্লাহর সাথে কথা বলার বা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের অভিপ্রায় নিয়ে আপনি নামাজে ডুবে যান, সেজদায় ডুবে যান তার মূল্যায়ন অবশ্যই ভিন্নরকম হবে।

অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রেও নিয়ত বা অভিপ্রায়ের বিষয়টি প্রযোজ্য। আপনার অর্থ উপার্জনের লক্ষ্য যদি হয় পার্থিব ভোগবিলাস, শানশওকত প্রদর্শন এবং মানুষের বাহবা পাওয়া, তাহলে স্রষ্টার কাছে আপনার পরিশ্রমের মূল্যায়ন সেইভাবেই হবে। মহাবিচার দিবসে আপনি আগুনের শাস্তি এড়াতে পারবেন না। আবার আপনার অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য যদি হয় আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়া, পরিবারের ভরণপোষণ ও আত্মীয়-প্রতিবেশীদের সাহায্য করা; তাহলে এই উদ্দেশ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্যে মহাবিচার দিবসে আপনি প্রভুর করুণাধারায় আপ্লুত হবেন।

আসলে নিয়ত যদি ঠিক থাকে, নিয়ত যদি কল্যাণকর হয়, নিয়ত যদি থাকে স্রষ্টার সন্তুষ্টি, সেই কাজটি যদি আপনি যৌক্তিক কারণে না-ও করতে পারেন, তবুও কাজটি করতে পারলে আপনি যে সওয়াব পেতেন, যেভাবে পুরস্কৃত হতেন আল্লাহর কাছে, নিয়তের কারণে আল্লাহ আপনাকে সেই পুরস্কার প্রদান করবেন।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, কোনো ভালো কাজের নিয়ত করার পর অসুস্থতার কারণে বা অন্য কোনো বাধা বা বাস্তব প্রতিবন্ধকতার কারণে আপনি যদি সেই কাজটি সম্পন্ন করতে অক্ষম হন, কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারলে যতটা পুরস্কার আপনি পেতেন, কেবল আন্তরিকভাবে ভালো কাজ করার নিয়ত করার কারণে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ততটাই পুরস্কৃত করবেন।

আল কোরআনে সূরা লাইলের ১৭ থেকে ২১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কারভাবে বলেছেন :

'যারা আল্লাহ-সচেতন এবং কারো কাছ থেকে প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়াই শুধু মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি ও আত্মশুদ্ধির জন্যে নিজ সম্পত্তি থেকে দান করে তারা লাভ করবে অফুরন্ত তৃপ্তি ও সন্তোষ।'

নবীজী (স) আমাদেরকে প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করতে বলেছেন। নবীজীর (স) এই মহান শিক্ষা অনুসরণ করে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, আর্থিক জীবন, আত্মিক-আধ্যাত্মিক জীবনের প্রত্যেকটি দিককেই কল্যাণময় করে তুলতে পারি। ইহকাল এবং পরকাল—উভয়কালেই আমরা সফল এবং সম্মানিত হতে পারি। অর্থাৎ যখন কোনো কাজ করবেন তখন নিয়ত থাকবে স্রষ্টার সন্তুষ্টি।

সফল পেশাজীবীদের মধ্যে হতাশা ডিপ্রেশন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা অ্যাংজাইটি কেন আসে? শুধু টাকাপয়সা পদমর্যাদা ও সামাজিক স্বীকৃতির জন্যে কাজ করলে একজন মানুষ ক্লান্ত ও হতাশ হতে বাধ্য। যদি তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিতে পারেন যে, আমি কেবল টাকাপয়সা, সামাজিক মর্যাদা বা খ্যাতির জন্যে নয়, এই কাজ করছি আমার প্রভুর সন্তুষ্টির জন্যে; তাহলেই কিন্তু সমীকরণ বদলে যায়। তিনি তখন প্রভুর হাতিয়ার হয়ে যান।

আর যে প্রভুর হাতিয়ার হয়ে যায়, তার দ্বারা ভুল কম হয়। ভুল কম হলে অনুশোচনাও কম হবে। স্রষ্টার সন্তুষ্টির

জন্যে কাজ করলে আপনার মধ্যে কখনো হতাশা আসবে না। যে-কোনো কাজের জন্যে এই মাইন্ডসেট বা নিয়তটা তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আসলে স্রষ্টা যে ভালো কাজগুলোর কথা বলেছেন, সে ভালো কাজগুলো আমরা শুধু স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে করব। আর যে-সব খারাপ ও ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, শুধু স্রষ্টার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই সেগুলো করা থেকে বিরত থাকব। তাহলে দুনিয়াতেও আপনি সম্মানিত হবেন, আখেরাতেও আপনি সম্মানিত হবেন।

দৃষ্টিভঙ্গি : বাস্তবতা বদলে দেয়

যে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে, আল্লাহ তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বদলে দেবেন।

—*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* হাকেম

কঠোর পরিশ্রমই উত্তম পুরস্কার আনে। আল্লাহ যখন কারো মঙ্গল চান, তখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন। যে ব্যক্তি ইতিবাচকভাবে বিষয়টি গ্রহণ করে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন (সে বিজয়ী হয়)। আর যে বিরক্তি ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হন (সে ব্যর্থ হয়)।

—*আনাস ইবনে মালেক (রা);* তিরমিজী, ইবনে মাজাহ

মগ্নপাঠ

অধিকাংশ মানুষের জীবনে ব্যর্থতা অশান্তি ও অস্থিরতার কারণ হচ্ছে চ্যালেঞ্জ বা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হলে তিনি বিরক্ত হন এবং নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। অথচ বিষয়টিকে তিনি যদি ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতেন, তাহলে এই বিপদ বা চ্যালেঞ্জের মধ্য থেকেই তিনি সুযোগ বের করে নিতে পারতেন। কিন্তু নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া এবং বিরক্তি তাকে নতুন স্তরে উন্নীত করার পরিবর্তে হতাশায় নিমজ্জিত করে। এই হাদীসের পরিপূরক বর্ণনা আমরা পাই আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে।

সেখানে নবীজী (স) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সাধারণ বিশ্বাসীর চেয়ে অটল বিশ্বাসীকে আল্লাহ বেশি পছন্দ করেন। প্রতিটি কল্যাণকর কাজে সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়ো। আল্লাহর কাছে তা চাও এবং পাওয়ার জন্যে বিরামহীনভাবে লেগে থাকো। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো। কখনো হাল ছেড়ে দিও না। কোনো বিপদ-মুসিবত এলে কখনো বোলো না যে, 'যদি এটা না করতাম, তাহলে এ বিপদ হতো না'। কারণ এই 'যদি' শব্দটি বিভ্রান্তির দরজা খুলে দেয়। বরং বলো, 'আল্লাহ যা নির্ধারিত করেছেন, তা-ই হয়েছে'।

এই হাদীসটির মর্ম হচ্ছে, যে-কোনো বালা-মুসিবত আসুক, সেটাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে হবে। যা ক্ষতি হয়ে গেছে, সেটাকে তো আর উল্টানো যাবে না। তাই হা-হুতাশ নয়, ক্ষতি থেকে উত্তরণের জন্যে ভবিষ্যৎ

পরিকল্পনা ও কাজের পেছনেই সময় দিতে হবে।

'যদি এটা না করতাম'—এ ধরনের কথা আপনাকে ভবিষ্যতের চেয়ে অতীতেই নিমজ্জিত করে রাখবে। অতীতে আপনি কখনো ফিরে যেতে পারবেন না। আপনাকে যেতে হবে ভবিষ্যতের পানে। অতএব ভবিষ্যতে কী করতে পারেন, সেই পরিকল্পনা সাজানোটাই বুদ্ধিমানের কাজ। নবীজী (স) এই বাণী সেই নির্দেশনাই দিয়েছেন।

অতএব প্রিয় সুহৃদ, আপনার জীবনে বিপদ-মুসিবত ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট শত্রুতা-দুর্বিপাক যা-ই আসুক, একজন বিশ্বাসী হিসেবে আপনি এগুলোকে ইতিবাচকতার সাথে পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করবেন। কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া বা বিরক্তি প্রকাশ করবেন না। 'যদি এটা না করতাম, তাহলে এই বিপদে পড়তাম না'—এ ধরনের কোনো নেতিবাচক কথা, নেতিবাচক চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। বিভ্রান্তিতে ভুগবেন না।

সবসময় আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে ভবিষ্যতে কী করতে পারেন, সেটা নিয়ে ভাবুন। বিপদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুযোগ এবং দুঃখের মধ্যে সুপ্ত থাকা সুখ বের করে আনার জন্যে স্রষ্টা আপনাকে যে মস্তিষ্ক দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, জ্ঞান দিয়েছেন সেটাকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করবেন। তখন যেভাবে আপনি প্রত্যাশা করবেন, পরম প্রভু সেভাবেই আপনার প্রয়াসকে পুরস্কৃত করবেন।

অপ্রয়োজনীয়-অপ্রাসঙ্গিক কথা

ধর্মপরায়ণতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে—যে বিষয়ে তুমি সংশ্লিষ্ট নও, সে বিষয়ে তুমি নাক গলাবে না।

—*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী, আশকালানী

মগ্নপাঠ

আমরা নিজেদেরকে ধর্মপরায়ণ ভাবতে পছন্দ করি, ভালবাসি। তবে আমরা অনেকেই ধর্মপরায়ণতার উপকরণ-উপাদান সম্পর্কে সেভাবে সচেতন নই। সচেতন নই বলেই আমাদের অকারণ ভুল, অকারণ পাপের পরিমাণ সবসময় বেশি হয়।

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত এই হাদীসে অল্প কথায় খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। নবীজী (স) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন :

ধর্মপরায়ণতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে, যে বিষয়ে তুমি সংশ্লিষ্ট নও, সে বিষয়ে তুমি নাক গলাবে না।

নির্দেশনা কিন্তু সুস্পষ্ট। কিন্তু আমাদের অধিকাংশের স্বভাবই হচ্ছে যে বিষয়ে আমার করণীয় কিছু নেই, যে বিষয়ে আমার ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই, যে বিষয়ে আলাপ আলোচনা বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, সেই বিষয়েও আমরা মন্তব্য করি, আমরা কথা বলি, আমরা বিতর্ক করি এবং সময় নষ্ট করি।

কোন দেশের প্রেসিডেন্ট কে হবে, হলে কী করবে, এখন কী করছে সেটা নিয়ে আমাদের অকারণ কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। যিনিই প্রেসিডেন্ট হোন, তিনি নিজের দেশের স্বার্থেই কাজ করবেন। আমার এ-ক্ষেত্রে করার কিছুই নেই। অকারণ আলোচনা, অকারণ বাহাস, অকারণ নিন্দা বা অকারণ প্রশংসা আমার সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই করে না। রুপালি পর্দার তারকারা কে কী করল, কোন খেলোয়াড় কী

করল, এটা নিয়ে চায়ের পেয়ালায় আমরা তুফান তুলে ফেলি। এমন এমন মানুষ সম্পর্কে আমরা কথা বলি, মন্তব্য করি, নাক গলাই যার সাথে আমাদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। যখনই এই কাজগুলো করি, ধর্মপরায়ণতা থেকে আমরা বিচ্যুত হই।

বিশিষ্ট সাহাবী মুয়াজ ইবনে জাবল (রা) একবার নবীজীকে (স) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা যে-সব কথা বলি সেগুলোর জন্যেও কী আমাদের হিসাব দিতে হবে? নবীজী (স) বললেন, মুয়াজ! যারা জাহান্নামের আগুনে পুড়বে তাদের একটা বড় অংশই এই জিহ্বার কারণে পুড়বে।

অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় কথা (মন্দ কথা) তাদের নরক যন্ত্রণার কারণ হবে। শায়খ আবুল হাসান খারকানি (৯৬৩-১০৩৩) এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা প্রায়ই বলতেন—

লোকমান হেকিম তার প্রজ্ঞার জন্যে সুপরিচিত ছিলেন। একবার তিনি তার ছেলেকে বললেন : 'আমার প্রিয় পুত্র, আজ তুমি রোজা রাখো। সারাদিন ধরে যত কথা বলবে, রাতের বেলা সেগুলো লিখবে। নোটগুলো আমাকে বুঝিয়ে দেয়ার পর তুমি রোজা ভাঙবে।'

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হলো। লোকমান হেকিমের ছেলে লিখতে বসল। লিখছে তো লিখছে। এদিকে ক্ষুধাও বাড়ছে। যখন লেখা শেষ হলো, তীব্র ক্ষুধায় তার পেট চোঁ চোঁ করছে।

লোকমান হেকিম পরদিনও একই নির্দেশ দিলেন। ইফতার করতে গিয়ে যথারীতি তার বেশ দেরি হয়ে গেল। তৃতীয় দিনও একই ঘটনা ঘটল। চতুর্থ দিন ছেলেটি অপ্রয়োজনীয় কথা

কমিয়ে দিল। তার বাবা যখন জিজ্ঞেস করলেন, এত কম লিখেছ যে? সে জবাব দিল : কথার হিসাব দিতে হবে এই ভয়ে আমি সারাদিন অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা বলি নি। তাই কম কথা বলেছি।

শায়খ খারকানি এই ঘটনাটি উল্লেখ করে বলতেন : যারা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বর্জন করতে পারবে, কেয়ামতের দিন লোকমান হেকিমের পুত্রের মতো তারা শান্তিতে থাকবে।

চারপাশে তাকালে আপনি দেখবেন, অধিকাংশ মানুষ আরেকজন কী বলল, কী করল, তার পোশাকটা কেমন লাগছে, তাকে কেমন দেখাচ্ছে—এগুলো নিয়ে কথা বলতেই ব্যস্ত। অথচ এই সময়টি সে যদি নিজের মেধার বিকাশ ঘটানোর কাজে, নিজের দক্ষতা বাড়ানোর জন্যে, নিজের কাজকে আরো সুন্দর করার পেছনে অথবা আত্মশুদ্ধির জন্যে ব্যয় করত, তাহলে তার খরচের হিসাব থেকে অর্জনের হিসাবটা অনেক বেশি হতো।

জীবন কিন্তু আপনার একটাই। আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট। যখন আয়ু ফুরিয়ে যাবে, অতিরিক্ত একটি সেকেন্ডও নিজের আয়ুর সাথে আপনি যোগ করতে পারবেন না। তাই প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করা উচিত দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হওয়ার জন্যে।

সূরা আনআম-এর ৭০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন, ‘পার্থিব ভোগবিলাসের মোহে যারা আচ্ছন্ন, বিনোদন খেল-তামাশাকেই যারা নিজেদের ধর্ম বা জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে আত্মপ্রতারণায় ভুগছে, তুমি তাদের সঙ্গ বর্জন করো। তুমি ওদের কোরআনের বাণী

শোনাও ও উপদেশ দাও। আর সতর্ক করে দাও সেদিন সম্পর্কে যেদিন ওদের সকল কৃতকর্মের হিসাব নেয়া হবে। আর তখন আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্যে ওদের কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না। সেদিন কোনো মুক্তিপণও গ্রহণ করা হবে না।'

আপনি প্রকৃত বিশ্বাসী কিনা তা যাচাই করার মাপকাঠি হলো, 'যে বিষয়ে তুমি সংশ্লিষ্ট নও, সেই বিষয়ে তুমি নাক গলাবে না'—নবীজীর (স) এই সুস্পষ্ট নির্দেশ আপনি কতটা মেনে চলছেন?

প্রখ্যাত বুজুর্গ হাসান বসরী (র) মনে করতেন, যখন কেউ এমন কোনো কাজে জড়িয়ে পড়ে যার সাথে সে সংশ্লিষ্ট নয়, তখন বুঝতে হবে সেই বান্দার ওপর থেকে আল্লাহ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

অতএব নিজে ধর্মপরায়ণ হওয়ার জন্যে যে-সব কথা ও কাজ আপনার জীবনে প্রয়োজন, যে বিষয়গুলোর সাথে আপনি সংশ্লিষ্ট, যে বিষয়গুলো আপনার জন্যে কল্যাণকর; সেই বিষয়গুলোর প্রতিই আপনার মনোযোগী হওয়া উচিত।

আপনার সময় ও শক্তি ব্যয় করুন নিজের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে, সৃষ্টির কল্যাণে।

নিরাপত্তাবোধের উৎস

সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখ তুমি ঘরে নিরাপদে আছ, শরীর সুস্থ আছে, ঘরে সারাদিনের খাবার আছে, তাহলে ধরে নাও পৃথিবীর সবই তোমার আছে!

—*ওবায়দুল্লাহ ইবনে মিহসান (রা);* তিরমিজী, মুফরাদ (বোখারী)

মগ্নপাঠ

সুখী হওয়ার জন্যে, পরিতৃপ্ত জীবনের জন্যে যে উপকরণ প্রয়োজন, তা নবীজী (স) একটি মাত্র বাক্যে বলে দিয়েছেন। বাক্যের প্রথম অংশ হলো—যদি দেখ তুমি ঘরে নিরাপদে আছ। অর্থাৎ সুখী ও পরিতৃপ্ত জীবনের জন্যে এই নিরাপত্তাবোধ প্রথম প্রয়োজন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

যখন একজন মানুষ অনুভব করে যে, সে এবং তার পরিবার নিরাপদ তখন সে অর্জন করে সুখী ও পরিতৃপ্ত জীবনের প্রথম উপকরণ। অন্যদিকে আতঙ্ক এবং ভয়ের কালো ছায়ার নিচে যদি বসবাস করতে হয়, মানবজীবনে এর চেয়ে বাজে পরিস্থিতি আর কিছু নেই।

নিরাপত্তাবোধ তখনই আসে যখন সম্মান সম্পদ পরিবার—কোনোকিছু নিয়েই ভয় পাওয়ার কিছু থাকে না। তাই সুখী হওয়ার পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো আতঙ্ক থেকে মুক্তি লাভ।

সুখী ও পরিতৃপ্ত জীবনের জন্যে নবীজী (স) দ্বিতীয় যে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো সুস্থতা। আসলে রোগ বা অসুস্থতা এবং রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয় বা আতঙ্ক সব ধরনের সুখকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে। আপনার হয়তো অনেক টাকা আছে। যা খুশি আপনি তা-ই কিনতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি অসুস্থ থাকেন, আরো অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কায় আপনি সেই সম্পদ ব্যবহার বা ভোগ করতে পারবেন না।

আমাদের দেশের একজন ধনকুবেরের ঘটনা। তার ডাইনিং টেবিলে ১৫-২০-২৫ পদ খাবার থাকত। প্রায়ই দেখা যেত যে, অন্যরা মহানন্দে খাচ্ছে। আর তিনি সেগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পেস্ট খাচ্ছেন। পেস্ট মানে স্রেফ জাউ। কারণ জাউ ছাড়া অন্য কোনোকিছুই তিনি হজম করতে পারতেন না!

অতএব শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ থাকলেই কেবল আপনি আপনার সম্পদকে উপভোগ করতে পারবেন।

এ হাদীসে তৃতীয় যে বিষয়ের ওপর নবীজী (স) জোর দিয়েছেন, তা হচ্ছে ঘরে সারাদিনের খাবার আছে কিনা। আপনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করতে পারেন যে, একদিনের খাবারই কি যথেষ্ট? আগামীকাল নিয়ে কি আমি ভাবব না?

অধিকাংশ মানুষ এখানেই ভুল করেন। আগামীকাল নিয়ে দুশ্চিন্তা করা আর আগামীকাল নিয়ে পরিকল্পনা করা—দুটোর মধ্যে তফাৎ আকাশ এবং পাতালের। দুশ্চিন্তাটা নেতিবাচকতা অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি। আর পরিকল্পনা হলো শুকরিয়া।

আগামীকালের জন্যে পরিকল্পনার সাথে নবীজীর (স) এই বাণীর কোনো বৈপরীত্য নেই, কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এই বাণীর মর্মার্থ হলো যে, আগামীকাল তো এখনো আসে নি এবং আগামীকালের প্রয়োজনটা ঘাড়ে চেপে বসে নি। অতএব আগামীকাল নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা কোরো না। নবীজী (স) আগামীকালের পরিকল্পনা কিংবা আগামীকালের জন্যে প্রয়োজনীয় সঞ্চয় করতে কখনো নিষেধ করেন নি।

যখন মদিনায় প্রাচুর্য এলো, তখন নবীজী (স) তার স্ত্রীদের একবছরের খাবার-দাবার ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংরক্ষণ করার অনুমতি দেন। যদিও তাঁর নিজের বিষয়টি আলাদা। তিনি নিজেই বলেছেন, তাঁকে যদি ওহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ ওজনের সোনাও দেয়া হয়, এটি দান করে দিতে তাঁর তিন রাতের বেশি লাগবে না।

কিন্তু নবীজী (স) তাঁর অনুসারীদের সবসময় পরিমিত ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন : 'মুহূর্তের বিলাসিতা বা খেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়ে সবকিছু ব্যয় করে ফেলো না। অপচয় কোরো না। প্রয়োজনীয় ব্যয় করো। দুনিয়া এবং আখেরাতের জন্যে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করো।'

অতএব সুখী হওয়ার জন্যে প্রথম প্রয়োজন পরিপূর্ণ নিরাপত্তাবোধ। আর পরিপূর্ণ নিরাপত্তাবোধ তখনই আসবে যখন আল্লাহর ওপর আপনার নির্ভরশীলতা বাড়বে, আল্লাহর ওপর আপনার ভরসা বাড়বে।

প্রিয় সুহৃদ! স্রষ্টার ওপর আপনার নির্ভরতা তত বাড়বে যত আপনি স্রষ্টার স্মরণ করবেন। যত তাঁর পছন্দনীয় কাজগুলো করবেন এবং অপছন্দনীয় কাজগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন, যত তাঁর নির্দেশ পালন করবেন।

আর তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে, প্রতিটি কাজ তুমি সবচেয়ে ভালোভাবে করবে। যখন আপনি ভেতর থেকে তাগিদ অনুভব করবেন—প্রতিটি কাজ ভালো করে করার, তত স্রষ্টার ওপর আপনার নির্ভরতা বাড়বে। তত আপনি নিরাপদ বোধ করবেন। তত আপনি সুখী ও সফল হবেন।

বিতর্ক এড়ানোর গুরুত্ব

ঝগড়া-বিবাদ ধর্মপরায়ণতার বিনাশ ঘটায়। ভুল বোঝাবুঝি ও ঝগড়া-বিবাদ দূর করে শান্তিস্থাপন করা নফল নামাজ, রোজা ও সাদাকার চেয়ে উত্তম কাজ।

—*আবু দারদা (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

ঝগড়াঝাঁটি ও অশান্তি সৃষ্টিকারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

—*হুজাইফা (রা);* বোখারী, মুসলিম

একরোখা ও বিতর্কে লিপ্ত মানুষকে আল্লাহ অত্যন্ত অপছন্দ করেন।

—*আয়েশা (রা);* মুসলিম, আশকালানী

মগ্নপাঠ

হাদীসে নামাজ রোজা ও সাদাকার চেয়ে উত্তম কাজ হিসেবে শান্তিস্থাপনকে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা ঝগড়া-বিবাদ-বিতর্ক ভুল বোঝাবুঝি যেমন বাড়ায়, তেমনি তা বিনষ্ট করে সামাজিক বুনন।

ঝগড়া-বিবাদ মানুষের সুকুমার বৃত্তির বিনাশ ঘটায়। তার বুদ্ধিবৃত্তিক মেধার সর্বনাশ ঘটায়। ঝগড়া-বিবাদ এমনকি ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র—সবকিছুকেই ধ্বংস করে দিতে পারে। যে কারণে নবীজী (স) কোনোরকম বিতর্কে জড়ানোকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। দুজন সাহাবী কোরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন এবং চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলেন। নবীজী (স) যখন সেখানে পৌঁছলেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বললেন, অতীতে অনেক নবীর উম্মতরা তাদের কিতাব নিয়ে মতবিরোধ ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে নিজেদের সর্বনাশ করেছে।

ইমাম শাফী (র) জ্ঞান নিয়ে যে কারো সাথে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়াকে জ্ঞানের অবক্ষয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তর্ক বা ঝগড়া-বিবাদ শুধু মনে অস্থিরতাই সৃষ্টি করে না, মনের শান্তিও বিনষ্ট করে। নির্মম সত্য হচ্ছে, তর্ক করে কখনো সত্য উপলব্ধির স্তরে পৌঁছা যায় না। আর এর জ্বলন্ত উদাহরণ ইমাম গাজ্জালী (র)।

তরুণ বয়সেই তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং তার জামানার শ্রেষ্ঠ তার্কিক হিসেবে খ্যাতিমান হন। একের পর এক আলেমকে তিনি বাহাস অর্থাৎ তর্কযুদ্ধে কুপোকাত করলেন। কিন্তু তর্কযুদ্ধে অন্যকে যত কুপোকাত করছেন, তার খ্যাতি যত বাড়ছে, তার মনের অস্থিরতাও তত বাড়তে থাকল। তার অন্তর থেকে শান্তি হারিয়ে গেল।

মনের অস্থিরতা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছল, সেই যুগে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসার ভিসির পদ ছেড়ে তিনি একদিন এক কাপড়ে আত্ম-অন্বেষণের পথে বেরিয়ে পড়লেন। নিজের ভেতরে ডুব দিলেন। ইয়াকিনের স্তরে পৌঁছার পর তিনি ইব্রাহিমের (আ) মাজারের সামনে দাঁড়িয়ে তিনটি প্রতিজ্ঞা করলেন। এর একটি হচ্ছে, আর কখনো বাহাস বা বিতর্কে তিনি অংশ নেবেন না। ইমাম গাজ্জালী (র) তার জামানার যুগ সংস্কারক হিসেবে *এহিয়া উলমুদ্দিন*-এর মতো কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্য দিয়ে ধর্ম থেকে নির্বাসিত ধ্যানকে ধর্মে পুনর্বাসিত করেন।

আসলে ঝগড়া-বিবাদ, তর্ক, ফ্যাসাদ মনের শান্তি নষ্ট করার পাশাপাশি সামাজিক বুননকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এজন্যেই নবীজী (স) নামাজ, রোজা বা সাদাকার চেয়েও ভুল বোঝাবুঝি ও ঝগড়া-বিবাদ দূর করে শান্তিস্থাপন করাকে উত্তম কাজ বলে বর্ণনা করেছেন।

ঝগড়া-বিবাদ, তর্ক-ফ্যাসাদ এবং অহেতুক প্রশ্ন করা থেকে নিজেকে সংযত রাখুন। এসবে কাউকে জড়িয়ে পড়তে দেখলে তাকে সংযত করার চেষ্টা করুন।

সম্পদ ও ভোগের দৃষ্টিভঙ্গি

বৈধভাবে উপার্জন করো ও বৈধ কাজে ব্যয় করো। তুমি পরিতৃপ্তি পাবে। অবৈধভাবে যত উপার্জনই করো না কেন, কখনো পরিতৃপ্তি পাবে না। আর মহাবিচার দিবসে অবৈধ সম্পদই তোমার কাল হবে।

—*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* বোখারী, মুসলিম

হে মানুষ! তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সৎ কাজে ব্যয় করো। তাহলে তোমার কল্যাণ হবে। আর যদি তা অকারণে কুক্ষিগত করে রাখো, তবে তোমার ক্ষতি হবে। প্রয়োজনীয় সম্পদ নিজের কাছে রেখে দিলে, সেজন্যে তুমি তিরস্কৃত হবে না। আর ব্যয় শুরু করবে যাদের দায়িত্ব তোমার ওপর রয়েছে, তাদের লালনের মধ্য দিয়ে।

—*আবু উমামা (রা);* তিরমিজী

যারা শুধু অর্থবিত্ত ও বিলাসী ভোগ্যপণ্যের পেছনে ছোটে তারা অভিশপ্ত! (তারা কখনো প্রশান্তি বা আলোকিত অন্তর্লোকের সন্ধান পায় না।)

—*আবু হুরায়রা (রা); বোখারী,* মুসলিম

মগ্নপাঠ

আধুনিক যুগযন্ত্রণার সবচেয়ে বড় কারণ ভোগ্যপণ্যের প্রতি আমাদের আসক্তি। বেনিয়া শোষকরা তাদের প্রচারবাগীশদের সহযোগিতায় কেনার উন্মাদনার জোয়ার তৈরি করেছে। তার ফলেই এই আসক্তি সৃষ্টি হয়েছে।

আর এই কেনার উন্মাদনার আগুনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তরুণ-তরুণীরা। ২০১১ সালে ১৭ বছর বয়সী চীনা তরুণ ওয়াংসাং কুন একটা আইফোন কেনার জন্যে তার কিডনি বিক্রি করে দিয়েছিল। তখন তার বক্তব্য ছিল, একটা কিডনিই যথেষ্ট। আমার দুটো কিডনি রাখার প্রয়োজনটা কী!

কিডনি বিক্রি করে সে আইফোন কিনেছিল। ২০১৯ সালে ওয়াংয়ের অবশিষ্ট কিডনিটি ফেইল করায় তাকে স্থায়ীভাবে ডায়ালিসিস মেশিনের সাথে বিছানায় আশ্রয় নিতে হয়। যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন এই বিছানা এবং মেশিনই তার ভরসা। এই বিয়োগান্ত ঘটনা পণ্যদাসত্বের চরম রূপ!

আধুনিক মানুষ যত ভোগ্যপণ্যের দিকে ঝুঁকছে তত সে ঋণ ও কিস্তির ফাঁদে আটকা পড়ছে। গার্মেন্টস কর্মী থেকে শুরু করে শিল্পপতি—ঋণ এবং কিস্তির হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছে না কেউই। তার উপার্জন যা-ই হোক না কেন পরিশ্রম করছে সে, আর কিস্তির সুদ ভোগ করছে মহাজন অথবা ঋণদাতা ব্যাংক।

জীবনদৃষ্টির একটি করুণ দিক সম্পর্কে প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক শিশুবন্ধু ডা. এম আর খান কৌতুক করে বলেছিলেন,

এখনকার মানুষ জীবনের প্রথম ২৫ বছর ব্যয় করে কীভাবে মালপানি অর্থাৎ টাকা উপার্জন করা যাবে, সেই শিক্ষা অর্জনের জন্যে। পরবর্তী ২৫ বছর সে অর্থবিত্ত ও ভোগ্যপণ্যের পেছনে ছোটে। শুধু কীভাবে টাকা কামাই করা যাবে, সেই চিন্তাই তার মাথায় ঘুরপাক খায়। স্বাস্থ্য পরিবার সমাজ মানুষ—কোনোদিকেই তার দৃষ্টি দেয়ার ফুরসত থাকে না।

একটা ভারসাম্যহীন এবং অস্থির জীবন কাটানোর পরিণতি হিসেবে সে যা উপার্জন করল, পরবর্তী ২৫ বছর অর্থাৎ ৫১ থেকে ৭৫ বছর—এই সময়টায় উপার্জনের টাকা সে ব্যয় করে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে ক্লিনিক আর ওষুধের পেছনে।

ডা. এম আর খান অত্যন্ত আফসোস করে বলেছিলেন, আর যদি সে খুব 'ভাগ্যবান' হয়, তার জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাবে লাইফ সাপোর্টে।

ভোগ্যপণ্যের প্রতি আসক্তি সৃষ্টিকারীরা আসলে অর্থের পূজারি। তাদের দেবতা হলো অর্থ। অর্থের জন্যে তারা সবকিছু করতে পারে। অর্থের জন্যে কত নিষ্ঠুরতা করা যায় তার জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো।

প্রথম সফল বহুজাতিক কোম্পানি হলো ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৭৫৭ সালে তারা বাংলা দখল করে। উদ্দেশ্য ছিল একটাই—বাংলার অর্থসম্পদ। বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ জনপদ তারা নির্বিচারে লুট করে। সাধারণ মানুষের সমস্ত অর্থ হাতিয়ে নিতে ১৭৬৯ সালে এক টাকায় তিন মণ দরে তারা চাল কেনে। সকল চাল গুদামজাত করে ফেলে। পরের বছর ১৭৭০ সালে টাকায় তিন সের করে চাল বিক্রি করে।

ফলে সকল টাকা ইংরেজ বেনিয়াদের হাতে চলে যায়। ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। বাংলার তিন কোটি মানুষের মধ্যে এক কোটি মানুষ না খেয়ে মারা যায়। একইভাবে ১৯৪৩ সালেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা বাংলায় পুনরায় কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে। দুর্ভিক্ষে বাংলায় কমপক্ষে ৪০ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল।

সম্প্রতি করোনা মহামারির সময়ে কী হলো? সমাজে সাধারণ মানুষের আয় কমে গেল। গরিব আরো গরিব হলো। কিন্তু আতঙ্কের ব্যাপারীরা, যারা ওষুধ কোম্পানির সাথে জড়িত, যারা টিকা কোম্পানির সাথে জড়িত, যারা আতঙ্ক প্রচারকারী মিডিয়ার সাথে জড়িত, তাদের বিত্তের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেল।

মুনাফার জন্যে অর্থপূজারিরা আতঙ্ক তৈরি করে, কৃত্রিম মহামারি দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে, যুদ্ধ লাগায়। যুদ্ধ থামলেও তারা সংকট জিইয়ে রাখে। তাদের উদ্দেশ্য একটাই—ধনসম্পদের পরিমাণ বাড়ানো। এজন্যেই নবীজী (স) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'যারা শুধু অর্থবিত্ত ও বিলাসী ভোগ্যপণ্যের পেছনে ছোটে তারা অভিশপ্ত।' তারা কখনো প্রশান্তি বা আলোকিত অন্তর্লোকের সন্ধান পায় না।

আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তারা অর্থের পেছনে এভাবে ছোটে কেন? এর জবাব রয়েছে আরেকটি হাদীসে। নবীজী (স) বলেছেন, 'বৈষয়িক প্রাচুর্যকে যে নিজের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে, আল্লাহ তার চোখের সামনে দারিদ্র্য (অর্থাৎ সব হারানোর ভয়-কে দৃশ্যমান করে রাখেন।'

এজন্যেই সে ভোগ্যপণ্য আর ধনসম্পত্তির পেছনে অন্ধের মতো ছুটতে থাকে। কারণ 'দারিদ্র্য' তার চোখের সামনে সবসময় ভাসতে থাকে। সব হারানোর ভয় সবসময় তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। তাই সে শুধু জমায় জমায় জমায়।

নবীজী (স) খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, বৈধভাবে উপার্জন করো ও বৈধ কাজে ব্যয় করো, তুমি পরিতৃপ্তি পাবে। অবৈধভাবে যত উপার্জনই করো না কেন, কখনো পরিতৃপ্তি পাবে না।

তিনি আরো বলেছেন, 'মানুষ বলে আমার ধন আমার সম্পদ। আসলে তোমার সম্পদের কতটুকু তোমার? তোমার সম্পদ হচ্ছে—এক, যা তুমি খেয়েছ। দুই, যা তুমি পরিধান করেছ। দুনিয়াতেই এ দুটি শেষ। তিন, যা তুমি দান করেছ। আখেরাতের জন্যে তা-ই তোমার সঞ্চয়। [ধনসম্পদ যা রেখে যাবে তা হবে উত্তরাধিকারীদের, তোমার নয়।] (মুসলিম)

আসলে ধনসম্পদ যে যা-ই রেখে যাক, তা তার উত্তরাধিকারীদের। তার নয়। তাই শুধু অর্থের পেছনে নয়, উপার্জনের পাশাপাশি নিজের স্বাস্থ্য, পরিবার ও স্বজনদের প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগী হোন। কেনার আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে সুখী পরিতৃপ্ত জীবনের অধিকারী হবেন। সন্ধান পাবেন এক আলোকিত অন্তর্লোকের।

ঋণ : সর্বস্বান্ত করার ফাঁদ

ঋণ সম্পর্কে সাবধান! মহাবিচার দিবসে প্রত্যেকের ঋণই শোধ করতে হবে।

—আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

আল্লাহর পথে শহিদ হলেও ঋণ মাফ করা হবে না। এর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

—আবু কাতাদা হারিস ইবনে রিবি (রা); মুসলিম

এমনকি কারো কাছ থেকে যদি সুঁই-সুতোও ধার নাও, তবে তা তাকে ফেরত দেবে। তা না হলে আমানতের খেয়ানতকারী হিসেবে মহাবিচার দিবসে তুমি অসম্মানিত হবে।

—আদী ইবনে উমাইরাহ (রা); আবু দাউদ

পরিশোধ না করার নিয়ত করে যদি কেউ ঋণ নেয়, তবে সে সাব্যস্ত হবে একজন চোর হিসেবে।

—আবু হুরায়রা (রা); ইবনে মাজাহ

ঋণশোধ না হওয়া পর্যন্ত একজন বিশ্বাসীর আত্মা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রবেশপথে আটকে থাকবে।

—আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী

মগ্নপাঠ

ঋণের চেয়ে মানুষকে নিঃস্ব সর্বস্বান্ত বিপর্যস্ত হতাশাগ্রস্ত করার মাধ্যম খুব কমই আছে। ঋণজর্জরিত মানুষের যে অবমাননা যন্ত্রণা কষ্ট, ঋণজর্জরিত হয়ে পাওনাদারের তাগাদা এড়ানোর জন্যে যিনি প্রতিনিয়ত পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, এমন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সেই যন্ত্রণা বোঝা সম্ভব নয়। এজন্যেই ঋণগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপারে পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থই মানুষকে সতর্ক করেছে।

যারা ঋণ প্রদান করে, সেই সুদখোর মহাজন পাওনা সুদ উসুল করার জন্যে যে-কোনো পর্যায় পর্যন্ত নামতে পারে। বহু দেশে বহু সভ্যতায় মিথ্যাচারের পর সবচেয়ে জঘন্য পাপ হিসেবে বিবেচনা করা হতো ঋণকে। কেন? কারণ ঋণগ্রস্ত হলে মানুষ মিথ্যা বলে। পাওনাদারের তাগাদার আতঙ্কে তার জীবন থেকে সমস্ত আনন্দ হারিয়ে যায়।

যে কারণে বর্তমানে সবচেয়ে ঋণজর্জরিত দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ৫০ বছর আগে মানুষ একান্ত বিপদে না পড়লে ঋণ নিতে চাইত না। আর আমাদের দেশে ঋণ নেয়াটাকে একটা অসম্মানজনক বিষয় মনে করা হতো। কিন্তু ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে আধুনিক মহাজনরা মানুষের সেই লজ্জাটাকে ভেঙে দিয়েছে।

এখন তো ঋণ নেয়া এবং ঋণ করে ঘি খাওয়া অর্থাৎ ঋণ করে ভোগ্যপণ্য কেনা এক শ্রেণির মানুষের ফ্যাশনে রূপান্তরিত হয়েছে। তারা ঋণ রেখেই মারা যায় এবং ঋণের বোঝা চাপে তার উত্তরাধিকারীদের ওপর।

অথচ ঋণ থেকে দূরে থাকার জন্যে নবীজী (স) তাঁর অনুসারীদের কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। বিশিষ্ট সাহাবী মোহাম্মদ ইবনে জাহাশ (রা) এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার আমরা রসুলুল্লাহর (স) সাথে বসে আছি। এমন সময় তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে হাতের তালু কপালে রেখে বলে উঠলেন, 'সুবহানাল্লাহ! কী কঠোর একটি নির্দেশ আমার ওপর নাজিল করা হলো।' আমরা কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেলাম না।

পরদিন সকালে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! কী কঠোর নির্দেশ নাজিল করা হয়েছে? তিনি বললেন, 'আল্লাহর পথে জেহাদ করে শহিদ হওয়ার পর যদি কারো জান ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং আবারও সে শহিদ হয়, তারপর আবার তাকে জীবিত করা হয়, আবারও সে শহিদ হয়, এতবার শহিদ হওয়ার পরেও সে ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পাবে না।'

এ কারণে নবীজী (স) প্রায়ই দোয়া করতেন, 'আউযুবিল্লাহি মিনাল কুফরি ওয়াদ্দাইন'। এর অর্থ হলো, কুফরি করা থেকে, সত্য অস্বীকার করা থেকে এবং ঋণ থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (নাসাঈ)

ঋণগ্রস্ত হওয়া নবীজী (স) কতটা অপছন্দ করতেন সেটা বোঝা যায় জানাজা পড়ানোর ব্যাপারে তার অনুসৃত নিয়ম থেকে। তিনি যখনই কারো জানাজা পড়াতে যেতেন, আগে খোঁজ নিতেন মৃতের কোনো ঋণ আছে কিনা। যদি মৃত ব্যক্তি দেনাগ্রস্ত হতো, তিনি সেই জানাজায় অংশ নিতেন না।

একবার জানাজা পড়াতে গিয়ে তিনি শুনলেন, মৃত ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত এবং সে এমন কোনো সম্পদ রেখে যায় নি যেখান থেকে ঋণ শোধ করা যাবে। নবীজী (স) সাহাবীদের বললেন, তোমরা জানাজা পড়ো।

কতটুকু ঋণ? খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, মৃত ব্যক্তিটি খুবই অল্প পরিমাণ ঋণ রেখে গেছে। মাত্র দুই বা তিন দিনার। উপস্থিত আরেক সাহাবা আবু কাতাদা (রা) আরজ করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি এই ঋণের জিম্মাদার হলাম। নবীজী (স) তখন জানাজার ইমামতি করলেন। পরদিন আবু কাতাদার সাথে দেখা হতেই নবীজী (স) জিজ্ঞেস করলেন, ঋণটা কি শোধ করেছ? আবু কাতাদা (রা) বললেন, সে মাত্র গতকাল মারা গেছে। পরদিন আবু কাতাদা (রা) এসে জানালেন, পাওনাদারের পুরো প্রাপ্য পরিশোধ করা হয়েছে। নবীজী (স) তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এখন সে শান্তি পাবে।

ঋণ শোধ করার ব্যাপারে নবীজী (স) যে তাগাদা দিতেন, এর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত একজন বিশ্বাসীর আত্মা প্রশান্তি পায় না। সে ঝুলে থাকে। জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।

সাহাবীরা এবং পরবর্তীতে তাবেঈ, তাবে তাবেঈন ও সমস্ত বুজুর্গ ঋণমুক্ত হয়ে মারা যাওয়ার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। ঋণ শোধ না করে যাতে মৃত্যু না হয়, সে ব্যাপারে তারা সবসময়ই অত্যন্ত সচেতন ছিলেন।

কালজয়ী গ্রন্থ *মসনবী*-র রচয়িতা মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩) যখন মৃত্যুশয্যায়, তার মনে পড়ল,

একজন তার কাছে ৫০ দিরহাম পাবে। ঋণের কথা মনে পড়ার সাথে সাথেই তিনি সক্রিয় হয়ে উঠলেন। ৫০ দিরহাম সংগ্রহ করার চেষ্টা শুরু করলেন। পাওনাদার ছিল মাওলানা রুমির শিষ্যদের একজন। সে খবর পেল যে, এই ঋণ শোধ করার জন্যে হুজুর অস্থির হয়ে গেছেন।

লোকটি দৌড়ে এলো রুমির কাছে। রুমিকে সে বলল, হুজুর, আমার পাওনা আমি মাফ করে দিলাম। জালালুদ্দিন রুমি তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ! একটা ভয়ংকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া থেকে আমি বেঁচে গেলাম।

আসলে ঋণের ব্যাপারে নবীজীর (স) এত কঠোর হওয়ার কারণ হলো, একজন মানুষ যখন ঋণ করে, তার চিন্তার বড় অংশ জুড়ে থাকে সে কীভাবে এ ঋণ শোধ করবে। ফলে পাওনাদারের সামনে সে সবসময় সংকুচিত হয়ে থাকে। সে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, অমুক দিন দেবো। যখন দিতে পারে না, তখন আবার এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের গুনাহ তার নামে জমা হয়। পাওনাদারের কাছে সে আরো অপদস্থ হয়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, আরবিতে ঋণের প্রতিশব্দ 'দাইন'। এই দাইন থেকে বাংলা শব্দ 'দেনা'-র উদ্ভব। এই দাইনের আরেকটি অর্থ হচ্ছে অপদস্থ। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণের জন্যে একদিকে সামাজিকভাবে অপদস্থ হয়। দ্বিতীয়ত, আত্মশুদ্ধি এবং সত্যিকার ইবাদতের পথ থেকেও সে দূরে সরে যায়।

ঋণের অর্থনীতি বা ঋণ করে ঘি খাওয়ার প্রবণতা একটা সুপারপাওয়ারকেও কীভাবে ঘুণপোকার মতো নিঃশেষ করে

দিতে পারে তার উদাহরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ক্রেডিট কার্ড এবং ঋণ করে ভোগ্যপণ্য কেনার যে মহামারি গত কয়েক দশকে মার্কিন সমাজে বিস্তার লাভ করেছে, মার্কিনিরা এখন তার ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হচ্ছে।

এখন থেকে ৭০ বছর আগে চীন পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র অর্থনীতির দেশ ছিল। সেখান থেকে তারা এক নম্বর অর্থনৈতিক শক্তিতে উন্নীত হয়েছে। চীনের কাছ থেকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার ঋণ করেছে। প্রতি ১০ জন মার্কিনির আট জন ঋণের জালে আটকা পড়ে আছে। তাদের অর্থনীতির অবস্থা, জীবনযাত্রার মান প্রতি বছর খারাপ থেকে আরো খারাপ হচ্ছে। এই ঋণ তাদের জীবন থেকে স্থিরতা এবং শান্তি কেড়ে নিয়েছে।

আসলে যার জীবনেই ঋণ ঢুকবে শুধু পরকালে নয়, তার ইহকালীন শান্তিও চরমভাবে বিনষ্ট হবে। ক্রেডিট কার্ডের ঋণ যেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তথাকথিত গর্বিত মালিকদের নিদ্রা ও প্রশান্তি কেড়ে নিয়েছে, একইভাবে তাদের জাতীয় অর্থনীতির ওপরেও ক্যান্সারের মতো প্রভাব ফেলেছে।

আসলে ঋণ মানুষকে সর্বস্বান্ত করে। এই কারণেই দ্বিতীয় খলিফা ওমর বিন খাত্তাব (রা) মানুষকে সতর্ক করে বলেছেন, তোমরা ঋণ সম্পর্কে সতর্ক থেকো! দুশ্চিন্তা দিয়ে এটা শুরু হয় এবং একসময় মানুষকে তা সর্বস্বান্ত ও নিঃস্ব করে দেয়।

যদি কোনো তুচ্ছ কারণে ঋণ করে থাকেন, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, ঋণ ছাড়াও আপনি চলতে পারতেন। ঋণ যে কারণেই হয়ে থাকুক, প্রতিজ্ঞা করুন এবং সচেষ্ট হোন যে,

আপনি এই ঋণ শোধ করে দেবেন। শোধের ব্যাপারে আপনি যদি আন্তরিক হন এবং পরম প্রভুর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেন, তিনি তো রাতকে দিন আর দিনকে রাত করতে পারেন। আপনার ঋণ প্রভু মুহূর্তে দূর করে দিতে পারেন।

আর ঋণমুক্ত হওয়ার জন্যে বিশেষ দোয়া রয়েছে। একবার মসজিদে নববীতে সাহাবী আবু উমামাকে (রা) অসময়ে বসে থাকতে দেখে নবীজী (স) তার কাছে গেলেন। বললেন, আবু উমামা, এখন তো নামাজের সময় নয়। এখানে বসে আছ কেন? আবু উমামা (রা) জবাব দিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! ঋণের চিন্তায় আমি পেরেশান।

তখন সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করার জন্যে নবীজী (স) তাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দেন। দোয়াটি হচ্ছে :

'হে আল্লাহ! দুশ্চিন্তা ও দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া থেকে, অক্ষমতা ও আলস্য থেকে আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি। হে আল্লাহ! ভীরুতা ও কৃপণতা থেকে, ঋণজর্জরিত ও পরাভূত হওয়া থেকে আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি।'

আবু উমামা (রা) পরবর্তীতে বলেন, এই দোয়া পাঠের বরকতে আল্লাহ আমাকে দুশ্চিন্তা ও ঋণ থেকে মুক্তি দেন।

প্রিয় সুহৃদ, ঋণের ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করুন। ক্রেডিট কার্ড দিয়ে, কিস্তিতে বা বাকিতে কোনো কেনাকাটা করার ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকুন। ঋণ থেকে নিজেকে ও পরিবারকে বাঁচান।

সাদাকা-সৎকর্ম : আসল সঞ্চয়

যাদের দ্বারা মানুষ সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়, আল্লাহ তাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন।

—*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* তাবারানী

সেবামূলক কাজে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহর পথে জেহাদকারী ব্যক্তির সমান। কাজ থেকে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত এ মর্যাদা বহাল থাকে।

—*রাফি ইবনে খাদিজ (রা);* তিরমিজী, মেশকাত

সামর্থ্য অনুসারে ইবাদত ও ভালো কাজ করা ওয়াজিব। আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় উত্তম কাজ বা আমল হচ্ছে—যা আমলকারী নিয়মিত করে।

—*আয়েশা (রা);* বোখারী, মুসলিম

নিজেকে নেপথ্যে রেখে যদি ভালো কাজ করা সম্ভব হয়, তবে তা-ই করবে।

—*জুবাইর ইবনে আওয়াম (রা);* সুনানে কুবরা

মগ্নপাঠ

আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে স্রষ্টার কাছে দাতার মর্যাদা চমৎকারভাবে উঠে এসেছে। নবীজী (স) বলেছেন, সকল সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহর পরিবার। আল্লাহর পরিবারের সাথে ভালো ব্যবহারকারী আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়।

অর্থাৎ স্রষ্টার কাছে প্রিয় সে-ই যে তাঁর পরিবারের সাথে ভালো আচরণ করে। সাদাকা বা দান হিসেবে ভালো আচরণ, ভালো ব্যবহার নিঃসন্দেহে প্রথম কাতারের।

দাতার মর্যাদা, দাতার প্রতি স্রষ্টার বিশেষ দয়ার কথা, বিশেষ অনুগ্রহের কথা হাদীসে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একইসাথে সাদাকা, দান বা সৎকর্মের বিস্তারিত সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। হাসিমুখে কথা বলা, ভালো কাজে উৎসাহিত করা, খারাপ কাজ থেকে কাউকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হওয়া, পথহারা মানুষকে পথ দেখানো, সুন্দরভাবে কারো প্রশ্নের উত্তর দেয়া, এমনকি অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা—এগুলো সবই সাদাকা বা দানের অন্তর্ভুক্ত।

অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, কাউকে পানি ঢেলে খাওয়ানো, স্ত্রী-সন্তান এবং অধীনস্থদের ভরণপোষণ, লালনপালন, স্ত্রীর সাথে হাসিমুখে কথা বলা, সন্তানকে আদর করা, প্রতিবেশীকে উপহার দেয়া, প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ করা সবটাই আল্লাহ সাদাকা বা দান হিসেবে গণ্য করেন।

একজন কারিগর বা মিস্ত্রিকে সাহায্য করা, কাউকে যানবাহনে উঠতে বা মালামাল যানবাহনে ওঠাতে সহযোগিতা

করা, রাস্তা থেকে চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টিকারী বস্তু যেমন কাঁটা সরানো, এতিমের লালনপালন, বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে সুবিচার করা বা আপস মীমাংসা করা। অর্থাৎ সৃষ্টির কল্যাণে, সেটা মানুষ হোক বা যে-কোনো প্রাণী, তার কল্যাণে করা প্রতিটি কাজ হচ্ছে সাদাকা এবং দান।

দাতা যে কল্যাণ লাভ করে, নবীজী (স) তা ১৪০০ বছর আগে জানিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা রোগমুক্তির জন্যে দান করো, সাদাকা দাও। তিনি খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন, পাপমোচনের জন্যে দান করো, সাদাকা দাও।

দান শুধু মানুষকে সুস্থ করে না, সেইসাথে সুখী এবং দীর্ঘায়ু করে। নবীজী (স) আরো বলেছেন, সেবামূলক কাজে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির মর্যাদা আল্লাহর পথে জেহাদকারী ব্যক্তির সমান এবং সেবামূলক কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার এই মর্যাদা বহাল থাকে।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে সেবামূলক কাজ সবসময়ই দাতা বা সেবকের সামাজিক বন্ধনকে জোরদার করে এবং যাদের সঙ্ঘবন্ধন যত ঐকান্তিক, ভয়-আতঙ্ক পেরেশানি থেকে তারা তত মুক্ত থাকেন। ফলে নিঃসঙ্গ সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির চেয়ে তাদের ভালো থাকা ও দীর্ঘায়ু লাভের সম্ভাবনা ৫০ শতাংশ বেশি।

দানের জন্যে শ্রেষ্ঠ মাস রমজান। যে-কোনো ভালো কাজের নেকি বা পুণ্য শুরু হয় ১০ গুণ থেকে। আর সৎদানের নেকি শুরু হয় ৭০০ গুণ থেকে। রমজান মাসে এই ৭০০ গুণের ওপরে কমপক্ষে ৭০ গুণ এবং যখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে দান করা হয়, তখন আরো ৭০ গুণ। অর্থাৎ ৭০০ x ৭০ x ৭০!

সাহাবীরা বলেন, নবীজী (স) সবচেয়ে বড় দাতা ছিলেন। রমজান মাসে তিনি দানের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিতেন। দান সম্পর্কে নবীজীর (স) দৃষ্টিভঙ্গি আরো পরিষ্কার বোঝা যায় উম্মুল মোমেনিন আয়েশা (রা) বর্ণিত একটি ঘটনা থেকে।

একবার বাড়িতে ভেড়া জবাই করা হলো। আয়েশা (রা) মাংস দান করে দেয়ার ব্যবস্থা নিলেন। কিছুক্ষণ পর নবীজী (স) ঘরে ফিরে শুনলেন যে, একটি ভেড়া জবাই করা হয়েছে। তিনি জানতে চাইলেন, ওটার কতটুকু আছে?

আয়েশা (রা) উত্তর দিলেন, ভেড়ার গর্দান ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। নবীজী (স) বললেন, আসলে গর্দান ছাড়া বাকি সবটাই রয়ে গেছে। (তিরমিজী)

অর্থাৎ সম্পদের যে অংশটুকু দান করা হয়, সেটুকুই আসলে দাতার উপকারে আসে। সব দেশে সব কালেই সুফি-বুজুর্গ মুনি-ঋষিরা মানুষকে বার বার আহ্বান জানিয়েছেন—সাধ্যমতো নিয়মিত দান করো, তোমার কল্যাণ হবে। আধুনিক বিজ্ঞানও একই কথা বলছে। যেমন, ২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় উঠে আসে, যারা নিয়মিত দান করেন, তাদের রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে এবং অন্যদের তুলনায় তারা বেশি সুস্থ ও সুখী।

যে বিপন্নের পাশে দাঁড়ায়, সে-ই মানুষ। আর দুস্থ বিপন্নের কল্যাণে আপনি যা দান করছেন, সেটাই আপনার জীবনের আসল সঞ্চয়। কারণ সৎ নিয়তে আপনি যা দান করেন, তা গ্রহীতার হাতে পৌঁছার আগেই পৌঁছে যায় আল্লাহর হাতে।

ইসলাম : শান্তি ও কল্যাণ

ইসলাম হচ্ছে সদুপদেশ সংযম সমর্পণ ও কল্যাণ কামনা। উত্তম ঈমানের প্রকাশ হচ্ছে সদাচরণ। উত্তম হিজরত হচ্ছে—আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা পরিত্যাগ করা।

—*আমর ইবনে আবাসা (রা);* আহমদ, মেশকাত

দ্বীনের ভিত্তি হচ্ছে আন্তরিকতা। এ আন্তরিকতা আল্লাহর প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, তাঁর রসুলের প্রতি, মুসলমানদের নেতা ও সাধারণের প্রতি।

—*আবু রুকাইয়া তামিম ইবনে আউস আদ-দারী (রা);* মুসলিম

আসলে আল্লাহ-সচেতনতা বা ধর্মানুরাগের অবস্থান হচ্ছে অন্তর। আবারও বলছি, আল্লাহ-সচেতনতা বা ধর্মানুরাগের অবস্থান হচ্ছে অন্তর।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

ধর্মপালনকে মানুষের জন্যে সহজ করো। একে মানুষের জন্যে কঠিন কোরো না। তাদের সুসংবাদ দাও। ভীতসন্ত্রস্ত করে ধর্ম থেকে তাদের দূরে সরে যাওয়ার কারণ হয়ো না।

—*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী

মগ্নপাঠ

নবীজী (স) ইসলামের অত্যন্ত সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন। তা হলো, ইসলাম হচ্ছে সদুপদেশ, সংযম, সমর্পণ ও কল্যাণ কামনা। এর পরের বাক্যেই বিশ্বাসের প্রকাশ্য রূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে—উত্তম ঈমানের প্রকাশ্য রূপ হলো সদাচরণ।

আপনার ভেতরে ঈমান আছে কিনা সেটা সুস্পষ্ট হবে আপনার আচরণ দেখে। যদি আপনার আচরণ সৎ হয়, তাহলে আপনার ঈমান নিঃসন্দেহে উত্তম। আর উত্তম হিজরত সম্পর্কে বলা হয়েছে, আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, তা পরিত্যাগ করাই উত্তম হিজরত।

হাদীসে ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রসুল—এই সাক্ষ্য দেওয়া। দুই, নামাজ কায়েম করা। তিন, যাকাত আদায় করা। চার, রমজান মাসে রোজা রাখা। পাঁচ, সামর্থ্য থাকলে হজ করা।

আর ধর্মের ভিত্তি সম্পর্কে খুব পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে আন্তরিকতা। আর আল্লাহ-সচেতনতা বা ধর্মানুরাগের অবস্থান অন্তরে। এজন্যে ধর্মের ব্যাপারে আন্তরিকতাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

নবীজী (স) খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন, ধর্মকে কঠিন ও কষ্টদায়ক করার জন্যে আমাকে প্রেরণ করা হয় নি। ধর্ম শিক্ষা দেয়া এবং ধর্মকে সহজ করার জন্যে আমি প্রেরিত হয়েছি। তিনটি ব্যাপারে তিনি সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

প্রথমত, ধর্মীয় নিগূঢ় বিষয়ে কখনো তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে না। তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন—অতীতে এই তর্ক-বিতর্ক বাহাস করতে গিয়েই বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, নবীজী (স) ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'অতীতে ধর্মচর্চা নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করেছে, তারা নিহত ও ধ্বংস হয়েছে'। তাই তিনি সবসময় মধ্যপন্থা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তৃতীয়ত, ধর্ম পালনকে মানুষের জন্যে জটিল ও কঠিন করতে মানা করেছেন। তিনি খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন, 'আল্লাহর দ্বীন, আল্লাহর ধর্ম খুব সহজ। কেউ এই দ্বীনকে কঠিন করে তুললে তার ওপরই তা চেপে বসবে'।

তিনি আরো বলেছেন যে, 'সবসময় সহজ সাবলীল বোধগম্য ভাষায় ধর্ম শিক্ষা দাও। আর ভেতরে যদি ক্রোধ আসে, রাগ আসে, যদি তুমি বুঝতে পারো যে তুমি রেগে যাচ্ছ তাহলে পুরোপুরি মৌন থাকো'। ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে অন্যের বিরুদ্ধে অন্যায় করতে সহযোগিতা করাকেই তিনি ধর্মান্ধতা বলেছেন।

তিনি সবসময় বলেছেন যে, 'ধর্মপালনকে মানুষের জন্যে সহজ করো। একে মানুষের জন্যে কঠিন কোরো না। তাদের সুসংবাদ দাও। ভীতসন্ত্রস্ত করে ধর্ম থেকে তাদের দূরে সরে যাওয়ার কারণ হয়ো না'।

আমরা যদি নবীজীর (স) পুরো জীবন দেখি, তিনি ধর্মকে এবং জীবনকে সবসময়ই সহজ করে দিয়েছেন মানুষের জন্যে। মানুষকে তিনি যন্ত্র হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেই বিবেচনা

করেছেন এবং মানুষ হিসেবেই তার প্রতি সমমর্মিতা প্রদর্শন করেছেন। এর উদাহরণ আমরা পাই একটা ছোট্ট ঘটনায়, যা তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারত, কিন্তু তিনি সেটার খুব সহজ মীমাংসা করে দিলেন। এটাই হচ্ছে শাশ্বত ধর্মের শিক্ষা, ইসলামের শিক্ষা।

ঘটনাটি আবু হুরায়রা বর্ণিত ও বোখারী শরীফে গ্রন্থিত। একদিন এক বেদুইন মসজিদে নববীতে এসে পেশাব করে দিল। উপস্থিত যারা ছিল তাদের মধ্যে একধরনের উত্তেজনা তৈরি হলো। তাকে শায়েস্তা করার জন্যে কয়েকজন দ্রুত উঠে দাঁড়াল এবং লোকটিকে ঘিরে ফেলল। কিন্তু নবীজী (স) সাহাবীদের বললেন, ওকে ছেড়ে দাও এবং জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলো। তারপর সাহাবীদের উপদেশ দিলেন যে, 'সবসময় মনে রাখবে যে, প্রতিটি বিষয় সহজ সমাধানের জন্যে তোমাদের পাঠানো হয়েছে। বিষয়টিকে কঠিন ও জটিল করার জন্যে নয়'।

আসলে নবীজী (স) প্রতিটি বিষয়কে দেখেছেন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। ফলে তিনি সবসময়ই সহজ সমাধানের পথে গিয়েছেন। এরকম বহু ঘটনা রয়েছে।

একদিন মসজিদে নববীতে একজন এসে বলল, হে আল্লাহর রসুল, আমি তো শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। আপনি আমাকে শাস্তি দিন। এই কথোপকথনের মধ্যেই নামাজের ওয়াক্ত হলো। সে নবীজীর (স) সাথে নামাজ আদায় করল। নামাজ শেষে আবার সে বলল, হে আল্লাহর রসুল, আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি, আমাকে শাস্তি দিন।

নবীজী (স) জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আমাদের সাথে নামাজে হাজির ছিলে?' সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, 'তোমার গুনাহ মাফ হয়ে গেছে'।

ধর্মের ব্যাপারে, ধর্মপালনের ব্যাপারে, ধর্মাচারের ব্যাপারে নবীজী (স) কত উদার এবং সহজ ছিলেন, এই ঘটনাগুলো থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি!

নবীপ্রেমিক হিসেবে, নবীজীর অনুসারী হিসেবে এবার একটু ভাবুন। আপনি কি আপনার জন্যে ধর্মকে সহজ করেছেন নাকি আপনি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন?

আপনি কী দ্বীনকে ধর্মপালনকে নিজের জন্যে কঠিন করে তুলেছেন? নাকি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন?

আপনি কি ধার্মিক না ধর্মান্ধ? সত্যিকারের ধার্মিক তিনিই যিনি ধর্ম পালন করেন। আর ধর্মান্ধ হচ্ছে সে, যে ধর্মের নামে অন্যের বিরুদ্ধে অন্যায় করতে সহযোগিতা করে। ধর্মান্ধ সবসময় ধর্মকে ব্যবহার করে নিজের ক্ষমতা, সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানোর চেষ্টা করে।

নবীজীর (স) জীবন সম্পর্কে জানুন এবং সেই আলোকে প্রকৃত ধার্মিক হয়ে উঠুন।

আল্লাহ ও আল্লাহ-সচেতনতা

আল্লাহ বলেন, বান্দার ধারণা অনুসারেই আমি তার সামনে প্রতিভাত হই। সে যখন প্রার্থনা করে, আমি তার সাথেই থাকি। সে যদি মনে করে—আমি তাকে অনুগৃহীত করব, আমি তাকে তখন অনুগৃহীত করি। আর যদি সে মনে করে—আমি তার প্রতি বিরূপ, তবে সে বিরূপতারই সম্মুখীন হবে।

—*আবু হুরায়রা (রা);* আহমদ

আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে যেভাবে কল্পনা করে, আমি তার জন্যে সে-রকমই। যখন সে আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সাথে থাকি। সে যখন মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তখন তাকে স্মরণ করি। যখন সে কোনো সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, আমি তখন তার চেয়ে ভালো সমাবেশে তাকে স্মরণ করি।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

মগ্নপাঠ

হাদীসে আল্লাহ তাঁর সম্পর্কিত বান্দার ধারণাকে সুস্পষ্ট করেছেন। আপনার ধারণা অনুসারেই আল্লাহর শক্তি, আল্লাহর কুদরত আপনার সামনে প্রতিভাত হবে। আপনি যেভাবে প্রার্থনা করবেন, যেভাবে বিশ্বাস করবেন, সেই রূপেই তিনি প্রতিভাত হবেন।

তাঁকে যদি সর্বশক্তিমান, মহামহানরূপে ভাবেন, দয়ার সাগর, করুণার সাগর হিসেবে ভাবেন, তাহলে তাঁর শক্তির সেই রূপই প্রকাশ পাবে আপনার সামনে। আপনি যখন তাঁর নির্দেশাবলি পালন করবেন, তখন আপনি তাঁর অনুগ্রহভাজন হবেন। যখন ক্রমাগত অনুগ্রহ প্রার্থনা করবেন, তখন তিনি আপনাকে ভালবাসতে শুরু করবেন। যখন তিনি ভালবাসবেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে আপনি দেখবেন, তাঁর কান দিয়ে আপনি শুনবেন, তাঁর হাত দিয়ে আপনি কাজ করবেন এবং আপনার যে-কোনো চাওয়া তিনি মুহূর্তে পূরণ করে দিতে পারেন। কারণ যে-কোনো কিছু দেয়ার ব্যাপারে পরম প্রভুর কারো অনুমতি নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

সেজন্যে আল্লাহ মহামহানের শক্তি এবং ক্ষমতা সম্পর্কে যত সচেতন থাকবেন, যত তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করবেন, তত তাঁর নৈকট্যকে আপনি অনুভব করবেন।

প্রতিটি কাজে পরম প্রভুর ব্যাপারে সচেতন থাকা অর্থাৎ কাজটি তিনি পছন্দ করছেন নাকি অপছন্দ করছেন, এটাই হচ্ছে তাকওয়া বা স্রষ্টা-সচেতনতা।

দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা) একবার বিশিষ্ট সাহাবী উবাই ইবনে কাব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাকওয়া কী। আল্লাহ-সচেতনতা ব্যাখ্যা করুন। উবাই ইবনে কাব (রা) বললেন, কন্টকাকীর্ণ সরু পথে যদি একটা ঢোলা আলখেল্লা পরে আপনাকে হাঁটতে হয়, আপনি কীভাবে হাঁটবেন?

ওমর (রা) হেসে বললেন, শরীরের সাথে আলখেল্লাটা ভালোভাবে জড়িয়ে নিয়ে আঁটসাঁটভাবে সতর্কতার সাথে হাঁটব যাতে আলখেল্লায় বা গায়ে কাঁটার আঘাত না লাগে। উবাই ইবনে কাব (রা) বললেন, এটাই হলো তাকওয়া বা স্রষ্টা-সচেতনতা। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকা। কারণ আপনি আল্লাহর ব্যাপারে সচেতন থাকুন আর না-ই থাকুন, আল্লাহ কিন্তু আপনার ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।

সূরা হাশরের ১৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ-সচেতন থেকো। প্রত্যেক মানুষেরই চিন্তা করা উচিত যে, পরকালের জন্যে সে আগাম কী পাঠাচ্ছে। (আবার বলছি!) সবসময় আল্লাহ-সচেতন থেকো। কারণ তোমরা যা করো সে ব্যাপারে আল্লাহ সচেতন রয়েছেন'। আল্লাহ আপনার ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন, প্রতি মুহূর্তে এটি অনুভব করে কাজ করাটাই হচ্ছে আল্লাহ-সচেতনতা।

ইমাম গাজ্জালী (র) *এহিয়া উলুমুদ্দিন*-এ চমৎকার একটি গল্পের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। এক দরবেশের কয়েকজন শিষ্য ছিল। তাদের মধ্যে একজনকে বাকি সবার চেয়ে বেশি স্নেহ করতেন ও গুরুত্ব দিতেন। অন্য শিষ্যরা এটা জানত।

একদিন তারা সবাই মিলে এসে অনুযোগ করল, হুজুর, আমরা আপনার এই শিষ্যের চেয়ে বয়সে বড়। বায়াতও নিয়েছি তার আগে। তবু আপনি আমাদের চেয়ে তাকে বেশি স্নেহ করেন। এর কারণ জানতে পারলে আমাদের মনের অস্থিরতা কমত।

হুজুর তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা সবাই একটা করে মোরগ আর চাকু নিয়ে আসো। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই একটা করে মোরগ এবং চাকু নিয়ে হাজির হলো। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন, মোরগটা ভালোমতো জবাই করে নিয়ে আসবে। তবে খেয়াল রাখবে, তুমি যে জবাই করছ, এটা যেন কেউ দেখে না ফেলে।

কিছুক্ষণ পর সবাই জবাই করা মোরগ নিয়ে হাজির। শুধু তার বিশেষ স্নেহভাজন সেই শিষ্য জবাই না করে জ্যান্ত মোরগ হাতে হাজির হলো। দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন, সবাই মোরগ জবাই করে এনেছে, তুমি মোরগ জবাই না করে নিয়ে এলে কেন? স্নেহভাজন শিষ্য বলল, হুজুর, মাফ করবেন। আমি অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও এমন কোনো জায়গা খুঁজে পেলাম না যেটা আল্লাহর নজরদারির বাইরে। যেখানেই জবাই করতে গিয়েছি, মনে হয়েছে আল্লাহ দেখছেন। তাই আর জবাই করতে পারি নি। হুজুর কিছু না বলে একটু হাসলেন। অন্য শিষ্যরা এই উত্তর শুনে লা-জবাব হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারল এই শিষ্যকে বিশেষ স্নেহ করার কারণটা কী।

আসলে স্রষ্টা-সচেতন বা আল্লাহ-সচেতন বান্দা এবং পাপীর মধ্যে পার্থক্য কী? এ ব্যাপারেও নবীজীর (স) একটা

সুন্দর হাদীস রয়েছে, সুন্দর উপমা রয়েছে। তিনি বলেছেন যে, বিশ্বাসীরা যে-কোনো পাপকে মনে করে একটা পাহাড়ের মতো, যার নিচে সে বসে আছে এবং পাহাড়টা যে-কোনো সময় তার মাথায় ভেঙে পড়তে পারে। আর পাপীরা পাপকে মনে করে মাছির মতো, যা নাকের সামনে উড়ছে এবং সে হাত দিয়ে এটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

সত্যিকারের আল্লাহ-সচেতন বান্দাদের পরিচয় রয়েছে সূরা আনফালে : 'সত্যিকার বিশ্বাসী তো তারাই, আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, যখন তাঁর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়, তখন বিশ্বাস গভীর হয় এবং তারা শুধু তাদের প্রতিপালকের ওপরই ভরসা করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় (দান) করে। এরাই প্রকৃত বিশ্বাসী। প্রতিপালকের কাছ থেকে এরা পাবে মর্যাদা, ক্ষমা ও উত্তম জীবনোপকরণ'।

আপনি সচেতন না হলেও আল্লাহ আপনার ব্যাপারে সচেতন। তাঁর নজরদারির বাইরে আপনি কখনো যেতে পারবেন না। তাই যত অনুভব করবেন তাঁকে এবং তাঁর শক্তি ক্ষমতা দয়া ক্ষমা মহানুভবতা প্রাচুর্য সম্পর্কে যত সচেতন হবেন, তত আপনি প্রাচুর্যবান হবেন, আপনার মধ্যে তত মহানুভবতা দয়া ও ক্ষমাশীলতা আসবে। ইহকাল এবং পরকাল—দুই কালেই আপনি সম্মানিত হবেন। পরম প্রভুর করুণায় ধন্য হবেন।

বায়াত : পরিত্রাণের উপায়

যে আমার [নবীজী (স)] আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। যে আমাকে অমান্য করল, সে আল্লাহকে অমান্য করল। যে প্রাজ্ঞ নেতার আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে প্রাজ্ঞ নেতাকে অমান্য করল, সে আমাকেই অমান্য করল। প্রাজ্ঞ নেতা তোমাদের জন্যে ঢাল স্বরূপ।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

সঙ্ঘবদ্ধ থাকাটাই রহমতের। আর বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা হচ্ছে আজাবের।

—*নোমান ইবনে বশীর (রা);* আহমদ

তোমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে জীবনযাপন করবে। প্রাজ্ঞ নেতার আদেশ-নিষেধ (নিয়মকানুন) মেনে চলবে। সঙ্ঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। সমর্পিতদের সঙ্ঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ইসলামের সাথে বন্ধন ছিন্ন করার শামিল।

—*হারেস আল আশয়ারী (রা);* তিরমিজী, আহমদ

মগ্নপাঠ

ইহকালীন এবং পরকালীন সাফল্যের জন্যে সৎসঙ্গ এবং সৎসঙ্ঘ—দুটিই যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বায়াত অধ্যায়ের হাদীসগুচ্ছ থেকে তা সুস্পষ্ট। নবীজী (স) শুধু সত্য বলেই ক্ষান্ত হন নি। নবুয়ত লাভের পর যিনিই তাঁর এই সত্যবাণী গ্রহণ করেছেন, সত্য অনুশীলনের সুবিধার্থে তিনি তাদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ করেছেন। অনুসারীদের কোনো অবস্থাতেই তিনি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত থাকতে দেন নি। সময় এবং সুযোগ পেলেই একত্র করে সত্য অনুশীলনে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং তাদের প্রত্যেককেই সত্যের বাণীবাহকে রূপান্তরিত করেছেন।

নবীজী (স) সত্যবাণী প্রচারের প্রথমদিন থেকেই উপলব্ধি করেছেন যে, চারপাশের শয়তানি শক্তি, লোভ প্রলোভন অনাচার থেকে কোনো মানুষ একা ভালো থাকতে পারে না। সেজন্যে তিনি সঙ্ঘকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, জীবনকে সুন্দর করার জন্যে, সফল করার জন্যে, সহজ করার জন্যে, ভুল বোঝাবুঝি কমানোর জন্যে এমনকি তিন জনও যদি তোমরা একসাথে থাকো তাহলে অবশ্যই একজনকে নেতা মনোনীত করবে। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রসুল (স) বলেন, তিন জন যদি একত্রে সফর করো, তাহলে সকল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়ে একজনকে নেতা মনোনীত করো। (আবু দাউদ, মুসলিম)

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, Together each of us achieves more. আসলে মানুষ যখন নেতার নির্দেশনায়

সঙ্ঘবদ্ধভাবে চলে, তখন প্রত্যেকের অর্জনের পরিমাণ বেড়ে যায়। বিশ্বাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ রাখার জন্যেই নবীজী (স) বায়াতকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন।

বায়াত হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের শিক্ষাকে অনুসরণ করার অলঙ্ঘনীয় শপথ। সাহাবীরা এই অলঙ্ঘনীয় শপথ করে নবীজীকে (স) তাদের পথপ্রদর্শক, তাদের রসুল এবং সবক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা প্রদানকারী হিসেবে মেনে অনুসরণ করেছিলেন বলেই তারা অসত্য হিংসা ঘৃণা অসহিষ্ণুতা অর্থাৎ জাহেলিয়াতের অবসান ঘটিয়ে সত্য ন্যায় সাম্য মানবিকতা ও মানবাধিকারের বাস্তব রূপকারে পরিণত হতে পেরেছিলেন।

সঙ্ঘবদ্ধতার অপরিসীম গুরুত্বের কারণে বিদায় হজ-এর ভাষণেও রসুল (স) অনুসারীদের উদাত্ত নির্দেশনা দিয়েছেন যে, 'তোমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে নেতাকে অনুসরণ করবে'। এমনকি নামাজ যাকাত রোজা হজ পালনের সাথে সঙ্ঘবদ্ধভাবে নেতাকে অনুসরণ করার নির্দেশনা তিনি দেন। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী (স) বলেছেন, এমনকি কোনো কদাকার নিগ্রো দাসকেও যদি তোমাদের নেতা মনোনীত করা হয়, তবুও তার আনুগত্য করো। (বোখারী)

নবীজীর (স) ওফাতের পর সাহাবীরা সঙ্ঘবদ্ধ ছিলেন বলেই চারপাশের জাহেলিয়াত ও অমানবিকতার অবসান ঘটিয়ে তারা সত্যের আলোয় সাধারণ মানুষের জীবন আলোকিত করতে পেরেছিলেন।

চারপাশের নেতিবাচকতা স্বার্থপরতা ভোগসর্বস্ব জীবনের হাহাকার ও হতাশা থেকে যারা মুক্তি পেতে চান,

যারা ইতিবাচক নৈতিক ও আত্মিকভাবে আলোকিত জীবন চান, তাদেরকে অবশ্যই সৎসঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে। সৎ বন্ধু, সৎ শিক্ষক, সৎ ইমাম, সৎ গুরু—এদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যই আপনার ভেতরের সৎ মানুষটিকে সক্রিয় প্রাণোচ্ছল প্রাণবন্ত রাখতে পারে।

আত্মিক-আধ্যাত্মিক পরিত্রাণের জন্যে, নিজের বিশ্বাসকে অনড় গতিশীল রাখার জন্যে এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচার জন্যে বায়াত বা দীক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এজন্যে প্রতিটি ধর্ম উলিল আমর, ইমাম, গুরু, শিক্ষক বা গাইডকে অর্থাৎ বায়াত, দীক্ষা ও সঙ্ঘকে গুরুত্ব দিয়েছে।

ইমাম গাজ্জালী (র) *এহিয়া উলুমুদ্দিন*-এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—প্রবল বিশ্বাসী মানুষের সঙ্গে থাকো। তাদের কাছ থেকে প্রবল বিশ্বাসের, অনড় বিশ্বাসের শিক্ষা গ্রহণ করো। তাদেরকে অনুসরণ করো। তাহলে তাদের প্রবল বিশ্বাসের মতো তোমার বিশ্বাসও প্রবল হবে, শক্ত হবে, দৃঢ় হবে।

বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র) শয়তানের আক্রমণ থেকে নিজের অন্তরকে রক্ষা করার জন্যে মাশায়েখ অর্থাৎ শিক্ষক বা গুরু যে পথনির্দেশনা দেন, সেটা অনুসরণের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'সত্যিকারের মাশায়েখ বা শিক্ষক তোমাকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করতে পারবে। কারণ তারা সেই পথেরই যাত্রী'।

জালালুদ্দিন রুমি তার মসনবীতে চমৎকারভাবে বলেছেন, 'যে পথিক পথপ্রদর্শক, শিক্ষক বা গাইড ছাড়া যাত্রা শুরু করে, দুদিনের পথ পাড়ি দিতে তার লাগবে দুইশ বছর!'

নবীজী (স) সফল-সার্থক জীবনের জন্যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে উলিল আমর বা খলিফাকে, নেতাকে অনুসরণ করার গুরুত্ব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত ও মুসলিম শরীফে গ্রন্থিত—রসুল (স) বলেন, যে ব্যক্তি বায়াতের বন্ধন (সঙ্ঘ ও নেতার প্রতি আনুগত্যের শপথ) ছাড়া মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।

স্বাভাবিকভাবে আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আমার শিক্ষক গাইড উলিল আমর ইমাম বা খলিফা হিসেবে কাকে গ্রহণ করব? আমরা ভুল করি একটি জায়গায়। আমরা শায়খ বুজুর্গ আধ্যাত্মিক পুরুষ ইত্যাদি শব্দ শুনলেই অলৌকিকত্ব দেখতে চাই।

ইমাম ইবনুল আরাবী (র) খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন, 'শায়খ বা শিক্ষক হওয়ার জন্যে, গুরু হওয়ার জন্যে যা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে শিষ্যের আত্মিক-আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূরণের যোগ্যতা'। অর্থাৎ আত্মিক-আধ্যাত্মিক শিক্ষক হিসেবে কাউকে মনোনীত করার ক্ষেত্রে তার বসন, তার লেবাস বা তার চেহারার দিকে না তাকিয়ে আপনি তার কথা এবং কাজ অর্থাৎ বক্তব্য এবং জীবনাচরণে মিল আছে কিনা সেটি বিশ্লেষণ করুন, পর্যবেক্ষণ করুন। তাহলেই আপনি জীবনের জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় বায়াত বা সঙ্ঘসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

বিশ্বাস ও বিশ্বাসী

যদি তুমি ভালো কাজ করে আনন্দ পাও এবং খারাপ কাজ করে ফেললে অনুতপ্ত হও, তাহলেই তুমি প্রকৃত বিশ্বাসী।

—*আবু উমামা (রা);* আহমদ, মেশকাত

নিজের জন্যে যা পছন্দ করো, অন্যের জন্যেও তা-ই পছন্দ করবে। তাহলেই তুমি প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারবে।

—*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

শোষক-নিপীড়কের সাথে যে জেনেশুনে চক্রান্তে লিপ্ত হয় বা নেপথ্যে সমর্থন দেয়, সে বিশ্বাসের সীমানার বাইরে চলে যায়।

—*আওস ইবনে শোরাহবীল (রা);* মেশকাত, বায়হাকি

প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে যে পেট পুরে খায়, সে বিশ্বাসী নয়।

—*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* মেশকাত, বায়হাকি

প্রয়োজন ছাড়া অন্যের বিষয়ে নাক গলাবে না। এটাই প্রকৃত বিশ্বাসীর পরিচয়।

—*আবু হুরায়রা (রা);* আবু দাউদ

মগ্নপাঠ

'আমি বিশ্বাস করি' কেবল এটুকু বললেই বিশ্বাসী হওয়া যায় না। শুধু কালেমা উচ্চারণ করলেই বিশ্বাসী হওয়া যায় না। সত্যিকারের বিশ্বাসের স্বাদ আপনি তখনই আস্বাদন করতে পারবেন যখন আল্লাহ ও তাঁর রসুল আপনার সবকিছুর চেয়ে প্রিয় হবেন। অর্থাৎ যখন আপনি আপনার মা-বাবা, সন্তানসন্ততি, পরিবার, ধন-সম্পত্তি, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে বেশি ভালবাসতে পারবেন, তখনই আপনি প্রকৃত বিশ্বাসের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবেন এবং যথার্থ বিশ্বাসী হতে পারবেন।

এ প্রসঙ্গে নবীজীর (স) সাথে হযরত ওমরের (রা) কথোপকথন স্মরণ করা যেতে পারে। নবীজী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : ওমর, আমাকে তুমি কতটা ভালবাসো? তিনি উত্তর দিলেন, আমার সবকিছুর (মা-বাবা, ছেলেমেয়ের) চেয়ে আমি আপনাকে বেশি ভালবাসি, তবে নিজেকে ছাড়া।

তখন নবীজী (স) বললেন, তোমার নিজের চেয়েও যদি আমাকে বেশি ভালো না বাসো তবে তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। উত্তরে ওমর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! এখন এই মুহূর্ত থেকে আমার নিজের চেয়েও আপনি আমার বেশি প্রিয়। নবীজী (স) তখন বললেন, 'হে ওমর! এখন তুমি যথার্থ বিশ্বাসী'। (বোখারী)

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত : নবীজী (স) বলেন, যেদিন আমি তোমার কাছে তোমার বাবা-মা সন্তানসন্ততি এমনকি

তোমার নিজের চেয়ে বেশি প্রিয় হবো, সেদিনই তুমি যথার্থ বিশ্বাসী হবে। (বোখারী)

নিজের পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধ্বে উঠে যখন আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের নির্দেশ অনুসারে জীবনকে সাজাতে পারবেন, তিনি যে কাজগুলো করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো সম্পাদন করবেন এবং যে কাজগুলো থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, সেগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারবেন, তখনই আপনি যথার্থ বিশ্বাসী হিসেবে আল্লাহর কাছে সম্মান লাভ করতে পারবেন।

আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণিত বোখারী শরীফের একটি হাদীসে এসেছে, নবীজী (স) বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসুল তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলেই তুমি সত্যিকার বিশ্বাসের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে। হাদীসে এসেছে, একজন বিশ্বাসী কখনো প্রতারণা, মিথ্যাচার, কৃপণতা, শোষক নিপীড়ককে সমর্থন দেয়া, লুটতরাজ, অন্যের অধিকার নস্যাৎ বা অন্যের দুর্ভোগের কারণ হতে পারে না। একজন যথার্থ বিশ্বাসী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে দেখলেই আল্লাহর কথা মনে পড়ে। যার কথা শুনলে বিশ্বাস জোরদার হয়।

আপনি বিশ্বাসের এই স্তরে কখন যেতে পারবেন? বিশ্বাসের ঐ স্তরে পৌঁছার জন্যে বিশ্বাসীর সঙ্গ লাভ করা, বিশ্বাসীর সাথে একাত্ম হওয়া, বিশ্বাসের বন্ধনে নিজেকে নিবেদিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিহাসের দিকে তাকান। সাহাবীরা নবীজীকে (স) নিজেদের চেয়েও ভালবাসতেন। নিজের সবকিছুর ঊর্ধ্বে তাঁকে

ভালবাসতেন। সাহাবীরা আলোকিত হয়েছেন বিশ্বাসের এই অনুসরণের মধ্য দিয়ে।

রসুলকে (স) ভালবাসার মধ্য দিয়ে তারা নিজেরাই বিশ্বাসের প্রতীক হয়েছেন। তাদের সাহচর্যে তাবেঈনরা আলোকিত হয়েছেন। তাবেঈনদের সাহচর্যে তাবে তাবেঈনরা আলোকিত হয়েছেন। আর তাদের সাহচর্যে বিভিন্ন ধারার ইমামরা আল্লাহ ও রসুলের প্রেমে নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়েছেন। আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করেছেন।

যুগে যুগে কালে কালে তাদেরকে যারাই অনুসরণ করেছেন, তাদের জীবনেও এই ছাপ পড়েছে। আমাদের উপমহাদেশেও অলি-বুজুর্গ আল্লাহওয়ালা মানুষরাই ছড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের শিক্ষাকে। মানুষকে দীক্ষিত আলোকিত করেছেন।

উপমহাদেশে হযরত শাহজালাল (র), হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতী (র), শেখ ফরিদ-উদ-দীন গাঞ্জে শাকর (র), শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া (র), শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র), মুজাদ্দেদে আল-ফেসানী (র), হযরত খান জাহান আলী খান (র), মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র), মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র), মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র)-এদের মতো অলি-বুজুর্গদের সান্নিধ্যে এসে অগণিত বিশ্বাসী বিশ্বাসের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছেন।

তারা যেভাবে তাদের ওস্তাদ, তাদের শিক্ষক, তাদের মাশায়েখের সাহচর্যে থেকে দিক-নির্দেশনা অনুসরণের মধ্য

দিয়ে নিজেদের গড়ে তুলেছেন, একইভাবে আপনিও যথার্থ বিশ্বাসীর হাত ধরে, তার সঙ্গ ও সজ্ঘে লীন হয়ে নিজেকে যথার্থ বিশ্বাসের স্তরে উন্নীত করতে পারেন এবং সত্যিকারের বিশ্বাসের স্বাদ আস্বাদন করতে পারেন।

আসলে আলোকিত পথে চলা তখনই সহজ হয়, সম্ভব হয় যখন আপনি এমন কারো হাত ধরবেন যিনি সেই পথ সম্পর্কে জানেন, যিনি সেই পথে চলেন এবং যিনি সেই পথ দেখান।

স্বপ্ন : অনেক কিছুই বলে দেয়

তুমি যত সত্য কথা বলবে,
তোমার স্বপ্ন তত সত্য হবে।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে যেন বাস্তবেই আমাকে দেখল। কারণ শয়তান আমার চেহারা ধারণ করতে পারে না।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

ভালো স্বপ্ন দেখলে তুমি এটার ব্যাখ্যা করবে (অর্থাৎ অর্থ বোঝার চেষ্টা করবে)। খারাপ স্বপ্ন দেখলে এর ব্যাখ্যা করবে না, বলবেও না।

—*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী

মগ্নপাঠ

স্বপ্ন মানুষের চেতনার তৃতীয় মাত্রা। যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তরল এবং রহস্যাবৃত। সত্য স্বপ্নকে নবীজী (স) বলেছেন নবুয়তের অংশ। আর বোখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হাদীসে আছে, একজন বিশ্বাসীর স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬ ভাগের একভাগ।

স্বপ্ন নিয়ে যুগে যুগে কালে কালে গবেষণা রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা কম হয় নি। আগে সাধকরা যেমন এর রহস্য উদ্ধার করেছেন, একইভাবে আধুনিককালের মনোবিজ্ঞানীরাও স্বপ্নের রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করেছেন এবং চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

ধর্মগ্রন্থে যে-রকম স্বপ্নের উল্লেখ রয়েছে, তেমনি বিভিন্নকালে স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারীরা ইতিহাসখ্যাত অনেক স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছেন। পবিত্র কোরআন শরীফে নবীদের বেশ কয়েকটি স্বপ্নের কথা রয়েছে। সূরা ইউসুফের ৪-৬ আয়াতে স্বপ্ন এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যার এবং সতর্কতার উল্লেখ সুস্পষ্ট :

> স্মরণ করো! ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিল, 'হে আমার পিতা, আমি (স্বপ্নে) দেখেছি ১১টি নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সেজদা করছে।' (ইয়াকুব) জবাবে বলল, 'প্রিয় পুত্র, তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের বোলো না। বললে তারা (ঈর্ষাবশত) তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে পারে। আসলে শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (তুমি যেমন স্বপ্ন দেখেছ) তা-ই হবে।'

আসলে স্বপ্ন দেখাটা সহজ, ব্যাখ্যাটা অধিকাংশ সময়ই জটিল। অনেক সময় স্বপ্ন জানাজানি হওয়া ক্ষতির কারণও

হতে পারে। ওপরে উল্লেখিত স্বপ্নের প্রতিফলন ইউসুফের (আ) জীবনে ঘটে। সূরা ইউসুফের মর্মবাণী পাঠ করলেই যে-কোনো পাঠক এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। আল্লাহ তায়ালা এই স্বপ্নের মাধ্যমে ইউসুফকে (আ) তার অল্পবয়সেই ভবিষ্যতের মর্যাদার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। যদিও এই স্বপ্ন তার জীবনে বাস্তবায়িত হতে সময় লেগেছিল ৪০ বছর!

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন হতে সময় লাগে। কখনো কখনো যথেষ্ট সময় লাগে। কখনো কখনো যিনি স্বপ্ন দেখেছেন অনেক ঘটনাপ্রবাহের পর, অনেক চড়াই-উৎরাই পেরোনোর পর তার জীবনে শুভ স্বপ্নের ফল বাস্তবায়িত হয়।

আবার স্বপ্নের অনেক ধরন রয়েছে। কিছু স্বপ্ন কোনো অর্থ বহন করে না। স্রেফ হিজিবিজি স্বপ্ন। সারাদিনের কর্মতৎপরতার ফলে মস্তিষ্কে আবর্জনা জমে। স্বপ্ন সেই আবর্জনা পরিষ্কার করার একটা প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। কিছু স্বপ্ন আছে যেগুলোর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। যেমন, আপনি হয়তো রাতে স্বপ্ন দেখলেন যে, আপনি কাউকে কিছু উপহার দিচ্ছেন। সকালে ঘুম থেকে জেগে দিনের বেলায় আপনি তাকে সেই উপহার দেয়ার মধ্য দিয়ে স্বপ্নটি বাস্তবায়িত করতে পারেন।

দ্বিতীয় ধরনের স্বপ্ন প্রতীকী। ব্যাখ্যা ছাড়া যার অর্থ উদ্ধার করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব অভিজ্ঞ স্বপ্ন বিশারদ ছাড়া, স্বপ্ন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাধক বা ব্যাখ্যাতা ছাড়া এর অর্থ অন্যের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

তবে সাধারণভাবে স্বপ্ন ব্যাখ্যায় এক ধরনের অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বপ্নগুলো হয় প্রতীকী।

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও তাফসীরকার ইবনে কাসির (১৩০০-১৩৭৩) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *আন নিহায়া ওয়াল বিদায়া*-তে উল্লেখ করেছেন, একজন আব্বাসীয় খলিফা স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি একটি সিঁড়ির ২৮টি ধাপ অতিক্রম করে উপরে উঠেছেন। তিনি দরবারের স্বপ্ন ব্যাখ্যাতাদের কাছে এর ব্যাখ্যা চাইলেন।

একজন ব্যাখ্যাতা বললেন, ২৮টি সিঁড়ি মানে হচ্ছে আপনি ২৮ বছর খেলাফতে রাজত্ব করবেন। কিন্তু দেখা গেল যে, পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন এবং মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ২৮ বছর। অতএব এখানে ২৮টি সিঁড়ি তার ২৮ বছর রাজত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না। ছিল তার জীবনের ২৮টি বছরের সাথে।

অতএব যে-কোনো প্রতীক ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি দরকার। যার অন্তর্দৃষ্টি যত প্রখর, যার ক্বালবি জ্ঞান যত ব্যাপক, তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা তত সঠিক, তত সুন্দর, তত নিখুঁত। আবার একই প্রতীক, একই ধরনের স্বপ্ন দুই ব্যক্তির জন্যে দুই ধরনের অর্থ বহন করতে পারে।

প্রখ্যাত স্বপ্নবিদ ইমাম ইবনে শিরিন (৬৫৩-৭২৯) তার বইতে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একজন তার কাছে এসে বলল, সে স্বপ্নে দেখেছে যে সে আজান দিচ্ছে। ইবনে শিরিন হেসে বললেন যে, তুমি হজে যাবে। একই দিন আরেকজন এলো। সে একই স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি করল। সে-ও

বলল, আমি দেখেছি যে আমি আজান দিচ্ছি। ইবনে শিরিন তাকে বললেন, তুমি একটা চোর।

ইবনে শিরিনকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, দুজন মানুষের একই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনি দু-রকম দিলেন কেন? এর পেছনে রহস্য কী? যুক্তি কী? ইবনে শিরিন তখন বললেন, আমি প্রথম মানুষটির চেহারায় ধর্মপরায়ণতার গভীর ছাপ দেখেছি। সে ভালো মানুষ। আল্লাহ কোরআন শরীফে বলেছেন যে, হজে ডাকার জন্যে, কাবাঘর তাওয়াফ করার জন্যে হযরত ইব্রাহিম (আ) আজান দিয়েছেন। অতএব আমি অর্থ করলাম, এই মানুষটি হজে যাবে।

অপরদিকে অন্য ব্যক্তির চেহারায় আমি দুষ্টামি এবং পাপের ছাপ দেখলাম। আল্লাহ সূরা ইউসুফে বলেছেন যে, একজন ঘোষক চিৎকার করে বলল, ‘হে কাফেলার যাত্রীরা! তোমরা তো চোর।’ তাই আমি দ্বিতীয় জনের স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বুঝলাম যে, এই ব্যক্তি চোর।

নবীজী (স) সবসময়ই স্বপ্নকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। তার জীবনে অনেক পরিকল্পনা গ্রহণে স্বপ্ন সহায়ক হয়েছে। তিনি বদরের যুদ্ধের আগে স্বপ্ন দেখেন। ওহুদের যুদ্ধের আগেও স্বপ্ন দেখেন। সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে ওহুদের প্রান্তরে না গিয়ে মদিনায় থেকেই মোকাবেলা করার রণকৌশল তিনি প্রস্তাব করেন। কিন্তু উৎসাহী তরুণ সাহাবাদের উদ্দীপনায় সবাই যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করার পক্ষে মত দিলেন।

নবীজী (স) যেহেতু সবসময় পরামর্শভিত্তিক কাজ করতে পছন্দ করতেন এবং সবাইকে পরামর্শভিত্তিক কাজ করতে

উদ্বুদ্ধ করতেন, তিনি অধিকাংশের মতটাই গ্রহণ করলেন। হুদায়বিয়ায় যাত্রার আগেও তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তিনি নির্বিবাদে মক্কায় কাবাঘরে যাচ্ছেন এবং কাবাঘর তাওয়াফ করছেন। এই স্বপ্ন তাকে উদ্বুদ্ধ করে নিরস্ত্র অবস্থায় হজ করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে।

১৪শ সঙ্গীসহ নিরস্ত্র অবস্থায় নবীজী (স) শত্রু এলাকায় প্রবেশ করলেন এবং সেই যাত্রায় হুদায়বিয়ার ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করলেন। যা ছিল এক ঐতিহাসিক বিজয়। পরের বছর তিনি নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণভাবে সঙ্গীসাথিসহ ওমরাহ হজ পালন করেন।

নবীজী (স) প্রত্যেকদিনই ফজর নামাজের পরে মসজিদে নববীতে বসতেন। যারা নামাজে সমবেত হয়েছে তাদের খোঁজখবর নিতেন এবং স্বভাবসুলভভাবে জিজ্ঞেস করতেন, গতরাতে কেউ স্বপ্নে কিছু দেখেছে কিনা। তিনি প্রায়শই বলতেন, আমার পরে সুস্বপ্ন ছাড়া নবুয়তের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। শুধু তা-ই নয়, এই ভালো স্বপ্নকে তিনি নবুয়তের ৪৬ ভাগের একভাগ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

স্বপ্নের ব্যাপারে আমরা সবসময় নবীজীর (স) পরামর্শটি অনুসরণ করব। ভালো স্বপ্নের কথা প্রিয়জন ছাড়া কাউকে বলবেন না—এটাই নবীজীর উপদেশ। আর খারাপ স্বপ্ন যদি দেখেন, তখন বুঝবেন এটা শয়তানি অপশক্তির কাজ। এই অপশক্তির ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। আর খারাপ স্বপ্ন দেখে যদি ঘুম ভেঙে যায়, তখন শোয়া অবস্থাতেই বাম পাশে তিন বার থুতু ফেলবেন।

আসলে বাস্তবে থুতু ফেলতে হবে না। শুধু ঠোঁট নেড়ে থু থু থু করলেই হবে। তারপর পাশ পরিবর্তন করে ঘুমাবেন এবং তিনবার শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। তাহলে স্বপ্নের কোনো ক্ষতিকর প্রভাব আপনার ওপর কার্যকর হবে না। আর খারাপ স্বপ্নের কথা কাউকেই বলবেন না। যদি কাউকে না বলেন, তাহলে খারাপ স্বপ্নের কোনো ক্ষতিকর প্রভাব আপনার ওপর পড়বে না। যে-কেউ আপনাকে কোনো স্বপ্নের কথা বলুক, আপনি সবসময়ই বলবেন, ইনশাআল্লাহ! আপনি ভালো দেখেছেন।

বিশিষ্ট সাহাবী আবু সালামা (রা) খারাপ স্বপ্ন নিয়ে একসময় আতঙ্কিত থাকতেন। স্বপ্ন দেখে তিনি প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়তেন। নবীজীর (স) এই হাদীস শোনার পরে তিনি এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন। খারাপ স্বপ্ন নিয়ে আর কোনোদিন তার মনে দুর্ভাবনা আসে নি।

পরম করুণাময় আমাদের সবাইকে বিশ্বাসে বলীয়ান করুন এবং সুন্দর স্বপ্ন, সুস্বপ্নের ধারক করুন। আমরা যাতে নিজের জন্যে সুস্বপ্ন এবং অন্যের জন্যেও সুস্বপ্ন দেখতে পারি।

মা-বাবা : পরম আপনজন

যে ব্যক্তি তার পিতামাতার উভয়কে অথবা পিতা বা মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও তাদের খেদমত করা থেকে দূরে থাকল, সে আসলে জাহান্নামে যাওয়ার পথই প্রশস্ত করল। সে আসলেই হতভাগা!

—*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম, মুফরাদ, আহমদ

আল্লাহ একজনের অন্য সকল পাপের শাস্তি মহাবিচার দিবস পর্যন্ত স্থগিত রাখতে পারেন। কিন্তু পিতামাতার ন্যায্য হক আদায় না করার দোষে যে দোষী, তার প্রাথমিক শাস্তি এই পৃথিবীতেই তিনি দেবেন। আর পরকালের শাস্তি পরকালে।

—বায়হাকি

সন্তানের আচরণে পিতামাতা তুষ্ট হলে, আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। আর সন্তানের আচরণে পিতামাতা অসন্তুষ্ট হলে, আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

—*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* তিরমিজী, তাবারানী

মগ্নপাঠ

শুধু হাদীস নয়, পবিত্র কোরআনেও আল্লাহ স্বয়ং মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা লোকমানে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি তো সবাইকে তার মা-বাবার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা কষ্টের পর কষ্টস্বীকার করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে। আর তাকে বুকের দুধ ছাড়াতে লাগে পুরো দুই বছর। অতএব আমার প্রতি ও তোমার মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ হও'।

আল্লাহ শুধু তাঁর প্রতি নয়, মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন। আসল সত্য হচ্ছে, মা-বাবার বৃদ্ধ বয়সে তাদের জন্যে আমরা যা-ই করি না কেন, আমাদের বেড়ে ওঠায় তাদের যে ত্যাগ, সেই ত্যাগের বিন্দুমাত্র শোধ হবে না। কারণ তাদের লালনপালন ছাড়া, তাদের আদর-যত্ন ছাড়া শিশু অবস্থা থেকে কৈশোর বা তারুণ্যে পৌঁছা কোনো শিশুর পক্ষেই সম্ভব হতো না। আজকে আপনার যে অবস্থান, সেখানে পৌঁছার পেছনে তাদের ঋণ আপনি কখনো শোধ করতে পারবেন না।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) একবার দেখলেন যে, এক ইয়ামেনি যুবক তার মা-কে পিঠে তুলে কাবা তাওয়াফ করছে আর উচ্চস্বরে বলছে, 'আমি আমার মায়ের বিনম্র উট। অন্য উট আতঙ্কিত হতে পারে কিন্তু আমার কোনো ভয় বা আতঙ্ক নেই।' কিছুক্ষণ পর সেই যুবক আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের (রা) কাছে এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি মনে করেন—আমি তার ঋণ শোধ করতে পেরেছি?

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বললেন, তোমাকে জন্ম দেয়ার সময় মায়ের একটা আর্তনাদও তুমি শোধ করতে পারো নি।

সন্তানের লালনে মা-বাবার এই ত্যাগের কারণে পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম মা-বাবার প্রতি যথাযথ যত্ন নেয়ার গুরুত্ব আরোপ করেছে। মা-বাবার প্রতি সদাচরণকে একটা চমৎকার গুণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আর কোরআনের একাধিক আয়াতে তওহীদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসের পরেই মা-বাবার প্রতি কর্তব্যকে একজন মানুষের প্রধান দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

রসুলুল্লাহ (স) শুধু বিশ্বাসী মা-বাবার প্রতি ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দেন নি। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, 'পিতামাতা সত্য অস্বীকারকারী বা শরীককারী হলেও তাদের আন্তরিক খেদমত করবে'। (মুফরাদ, বায়হাকি)

ইমাম বোখারী তার বিখ্যাত বই *আল আদাব উল মুফরাদ* শুরুই করেছেন 'মা-বাবার প্রতি কর্তব্য' অধ্যায় দিয়ে। অর্থাৎ শুদ্ধাচারের প্রথম ধাপ হলো মা-বাবার প্রতি সদাচরণ।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবীজীকে (স) জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ কী? তিনি জবাব দিলেন, সময়মতো নামাজ আদায় করা। এরপর মা-বাবার প্রতি কর্তব্য পালন করা। তারপর আল্লাহর পথে জেহাদ করা।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত বায়হাকি শরীফের একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মুসলমান যার মা-বাবা রয়েছেন এবং যে প্রতিদিন সকালবেলা তাদের প্রতি কর্তব্য

সম্পাদনের নিমিত্ত তাদের সালাম করে; আল্লাহ বেহেশতের দুটো তোরণ তার জন্যে খুলে দেন। যদি তার মা-বাবার মধ্যে একজন থাকেন, তাহলে একটি তোরণ খোলা হয়। যদি তাদের কেউ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে তারা সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট হবেন না।

ইবনে আব্বাসকে (রা) জিজ্ঞেস করা হলো, যদি তার পিতামাতা তার সাথে অন্যায় করেন তাহলে? তিনি বললেন, তার পিতামাতা তার প্রতি অন্যায় করে থাকলেও তার কর্তব্য হচ্ছে তার পিতামাতার খেদমত করা।

মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব পালনকে নবীজী (স) কত গুরুত্ব দিয়েছেন তা আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণিত দুটো হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি। দুটো হাদীসই বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিজী শরীফে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

একদিন এক যুবক মা-বাবাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে নবীজীর (স) কাছে হিজরত করার শপথ নেয়ার জন্যে এলো। নবীজী (স) তাকে বললেন, 'তুমি তোমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাও। যে-রকম তাদেরকে কাঁদিয়েছ, একইভাবে তাদের মধ্যে হাসি এবং আনন্দ ছড়িয়ে দাও।'

আরেকবার জেহাদে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে এক যুবক নবীজীর (স) কাছে এসে উপস্থিত হলো। নবীজী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা-বাবা কি জীবিত রয়েছেন? যুবকটি বলল, জ্বী। নবীজী (স) বললেন, তাহলে ফিরে যাও এবং তোমার জেহাদকে জোরদার করো তাদের যথাযথ সেবাদানের মাধ্যমে।

মা-বাবার প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত, সূরা বনি ইসরাইলে আল্লাহ তায়ালা সেই নির্দেশ দিয়েছেন—'তোমার জীবদ্দশায় তাদের একজন বা উভয়েই যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবুও তাদের ব্যাপারে 'উহ-আহ' কোরো না। তাদের ধমক দিও না বা অবজ্ঞা কোরো না। তাদের সাথে আদবের সাথে কথা বোলো। শ্রদ্ধাভরা দৃষ্টিতে মমতার ডানা মেলে ছায়ার মতো আগলে রাখো এবং সবসময় তাদের জন্যে দোয়া করো, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার মা-বাবা শৈশবে যে মমতায় আমাকে লালন করেছেন, তুমিও তাদের ওপর সে-রূপ করুণা বর্ষণ করো।'

আসলে মা-বাবার প্রতি সদাচরণ করার ও তাদের যথাযথ যত্ন নেয়াকে আমাদের প্রত্যেকের জন্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করেছে ইসলাম। এর কারণ দ্বিবিধ।

সন্তান যখন তারুণ্যে বা যৌবনে পৌঁছায়, নিজেকে নিয়েই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার শক্তি, তার যৌবন, তার মর্যাদা তার ভেতরে গর্ববোধ সৃষ্টি করে। এই গর্ববোধ খুব সহজেই মা-বাবার প্রতি তার কর্তব্যে অবহেলার কারক হতে পারে। অনেকে নিজের মা-বাবার ব্যাপারে খরচ করার ক্ষেত্রে নিদারুণ কৃপণতার পরিচয় দেয়। আর মা-বাবার সাথে অসদাচরণ ও দুর্ব্যবহার এখন কোনো বিরল ঘটনা নয়।

অতএব মনে রাখতে হবে, যিনি মা-বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করবেন, মা-বাবাকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন, তিনি শুধু তার পরকালকেই ধ্বংস করবেন না, প্রাথমিক শাস্তি তাকে এই পৃথিবীতেই পেয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয়ত, নিজের মা-বাবার প্রতি কর্তব্য পালনে যার মধ্যে অনীহা বা অবহেলা থাকবে, সে আসলে কখনো অন্যদের প্রতি সমমর্মী হতে পারে না। ফলে মা-বাবার প্রতি অবহেলাকারী ব্যক্তি সমাজের প্রতি তার কর্তব্যও পালন করতে পারে না।

সমমর্মী শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ার জন্যে নবীজী (স) তাই মা-বাবার প্রতি কর্তব্য পালন করাকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন। বাস্তব সত্য হচ্ছে, মা-বাবার সাথে আপনি যে আচরণ করবেন, সেই আচরণের প্রতিফলনই ঘটবে আপনার জীবনে। ভালো আচরণ করলে ভালো প্রতিফলন, মন্দ আচরণের মন্দ প্রতিফলন। আপনার সন্তান আপনার সাথে সেই আচরণই করবে, যে আচরণ আপনার মা-বাবার সাথে আপনাকে করতে দেখবে। একটা ছোট্ট ঘটনা বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করবে।

এখন থেকে অনেক বছর আগের ঘটনা। ক্লাস টু-র এক ছাত্র স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখে ঘরের দরজা বন্ধ। ঘরে কেউ নেই। সে দরজার সামনে দাঁড়াতেই প্রতিবেশী খালা তাকে ডেকে নিল। তাকে বলল, তোমার দাদি মারা গেছেন। তোমার বাবা দাদির লাশ নিয়ে বাড়ি গেছেন। তোমার বাবা না আসা পর্যন্ত তুমি আমাদের বাসাতেই থাকবে।

তার বাবার যাওয়ার কারণ হলো, তার দাদির শেষ ইচ্ছা ছিল তার স্বামীর কবরের পাশেই যেন তাকে কবর দেয়া হয়। তো বাবা লাশ নিয়ে সদরঘাট গিয়েছেন। তখন নৌকাই ছিল বাহন। কোনো নৌকাই লাশ নিয়ে যেতে রাজি হলো না। এক নৌকা রাজি হলো কিন্তু বলল যে, সে নৌকা বাইতে পারবে না। তার বাবা মাঝিকে বসিয়ে রেখে নিজে কয়েক ঘণ্টা নৌকা

বেয়ে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছলেন এবং মাকে তার বাবার কবরের পাশে কবর দিয়ে ফিরে এলেন একদিন পরে।

এই শিশুটির অভিমান ছিল যে, তাকে রেখে বাবা চলে গেছেন। শিশুবয়সেই তার মনে এই ঘটনার ছাপটা খুব গভীরভাবে পড়ে। কিন্তু পরবর্তীতে সে এই ঘটনা নিয়ে গর্ববোধ করত যে, তার বাবা কয়েক ঘণ্টা নৌকা বেয়ে তার দাদিকে দাদার কবরের পাশে কবর দিয়েছে। শিশুবয়সে সে দেখেছে, তার বাবা তার দাদিকে কত আদর-যত্ন করত।

শিশু বড় হলো। তার বাবা বৃদ্ধ হলেন। কিন্তু ঐ স্মৃতি তার মনে সবসময় ছিল। ফলে সে-ও তার বাবা-মায়ের যত্ন করতে কখনো কোনো অবহেলা করে নি।

আপনার সন্তান আপনার কথা নয়, আপনার আচরণগুলোই মনে রাখবে। আপনি আপনার মা-বাবার প্রতি যে-রকম আচরণ করবেন, আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, তাদের প্রতি যে-কোনো অবহেলা, দুর্ব্যবহার, অবিচার, অন্যায় করলে সেটার শাস্তির একটি অংশ আপনার জীবদ্দশাতেই আপনি ভোগ করবেন।

আর যদি মা-বাবার যত্ন নিয়ে থাকেন, তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করে থাকেন, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন—আপনি ভাগ্যবান। যদি কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকে, শুধরে নিন, তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। মানুষ যে-কোনো জায়গা থেকে শুধরে নিতে পারে। নিজেকে শুধরে নেয়ার শুরু হোক মা-বাবার প্রতি সম্মানজনক আচরণ করার মাধ্যমে। কেননা শিষ্টাচারের শুরু মা-বাবার প্রতি কর্তব্য পালন থেকে।

বিয়ে ও দেনমোহর : সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

কোনো নারীকে চারটি যোগ্যতার জন্যে বিয়ে করা যায়—১. ধনসম্পত্তি ২. বংশমর্যাদা ৩. রূপ ৪. গুণ এমন নারী খোঁজ করো, যার গুণ আছে। অন্য বিবেচনায় বিয়ে করলে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম, আবু দাউদ

তুমি যত অঙ্গীকার করেছ, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর অঙ্গীকার হচ্ছে দেনমোহর। স্ত্রীর দেনমোহর দ্রুত পরিশোধ করো। (দেনমোহর পরিশোধ করা ফরজ।) দেনমোহরই স্ত্রীর সাথে তোমার দাম্পত্য সম্পর্ককে শুদ্ধতা দান করেছে।

—*উকবা ইবনে আমীর (রা);* বোখারী, মুসলিম

কোনো স্বামী যদি দেনমোহর প্রদানে গড়িমসি করে, স্ত্রীকে ধোঁকা দেয় এবং দেনমোহর না দেয়ার ফন্দিফিকিরের চিন্তা করতে করতে তা শোধ করার আগেই মারা যায়, তাহলে মহাবিচার দিবসে একজন ব্যভিচারী হিসেবেই তাকে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে।

—*শোয়াইব আল খাইর (রা);* তাবারানী

মগ্নপাঠ

'বিয়ে' শব্দটি শুনলেই মিডিয়ার বদৌলতে এমন এক চিত্র, এমন এক কল্পনা, এমন একটি বিষয় ভেসে আসে যে, এটা একটা বিশাল ব্যাপার। একটা দুর্লভ ঘটনা এবং একে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে ব্যতিক্রমী কী করা যায় সেই ভাবনায় তরুণ মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, অস্থির হয়ে ওঠে। এই অস্থিরতা, এই চঞ্চলতা, এই স্বপ্নকে পুঁজি করে সাম্রাজ্যবাদী শোষকরা সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে অপচয় ও অপব্যয়ে।

শুধু লোক-দেখানোর জন্যে, ফুটানি করার জন্যে যতভাবে সম্ভব জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন করার ক্ষেত্রে অন্যদের টেক্কা দিতে পারাকেই সম্মানের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। এই কাজ করতে গিয়ে অধিকাংশ মানুষ ঋণের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে।

অথচ বাস্তব সত্য হচ্ছে, বিয়ে জীবনের একটি স্বাভাবিক ঘটনা। হাজার হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষের জীবনে এই ঘটনা ঘটেছে। বিয়ে হচ্ছে একজন মানুষের দৈহিক মানসিক আত্মিক প্রয়োজন পূরণ ও বংশধারা বিস্তারের একটি সমাজ ও ধর্মসিদ্ধ প্রক্রিয়া। একে মহিমান্বিত করতে গিয়ে, চমক সৃষ্টি করতে গিয়ে, হুলুস্থূল করতে গিয়ে খরচের প্রতিযোগিতায় মত্ত হওয়া আহাম্মকি ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু মিডিয়া বিয়েকেও এখন একটা প্রোডাক্ট বানিয়ে ফেলেছে। আগে বিয়ের আয়োজন করত আপনজন, আত্মীয়স্বজনরা। এ ব্যাপারে পরিবারের তরুণ-তরুণীদের উৎসাহই ছিল সবচেয়ে বেশি।

আর এখন বিয়েও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের হাতে চলে গেছে। ফুটানি করার জন্যে আবার কেউ কেউ প্রচার করে যে, অমুক কোম্পানি এই বিয়ের আয়োজন করছে। অর্থাৎ নিষ্কলুষ অনাবিল আনন্দের পরিবর্তে বিয়ের আয়োজন লোক-দেখানো ফুটানির প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

অথচ ১৪০০ বছর আগেই নবীজী (স) বিয়ের সুখের রহস্য বলে গেছেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন, 'আর্থিক চাপমুক্ত বিয়েই স্বর্গসুখসম্ভবা বিয়ে'। (আবু দাউদ, বায়হাকি)

গত তিন দশক ধরে কোয়ান্টামে আমরা বলে এসেছি, যে বিয়েতে খরচ যত বেশি, অপচয় যত বেশি, সে বিয়েতে সুখের পরিমাণ তত কম। সাম্প্রতিক গবেষণায় বিশেষজ্ঞরা একই কথা বলছেন। যুক্তরাষ্ট্রের এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অর্থনীতিবিদ ৩,১৫১ জন দম্পতির ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, যে বিয়ে যত ব্যয়বহুল, সে বিয়ে তত দ্রুত ভেঙে যায়। এর কারণ বিয়েতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচের টেনশন। অতএব বিয়ের প্রোগ্রামে খরচ যত কম করা যায় তত ভালো। আমরা তাই বলি যে, বরপক্ষ কনেপক্ষ মিলে বিয়েতে একটা প্রোগ্রাম করুন। নবীজীও (স) নিজের বা তার সন্তানের কারো বিয়েতেই একটার বেশি প্রোগ্রাম করেন নি।

আসলে যত ভুঁইফোঁড় পরিবার আছে, ফুটানি করে জাতে ওঠার প্রবণতা তাদের সবচেয়ে বেশি থাকে। এরাই মূলত বিয়েকে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের হাতে ছেড়ে দেয়। এদের দেখাদেখি মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোও ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। ফলে বিয়েতে অপচয় করে তারা ঋণগ্রস্ত হয়।

ঋণ এবং অপচয়ের অভিশাপ বিবাহ-পরবর্তী জীবনকে অসুখী করে। কারণ অপচয়কারী হচ্ছে শয়তানের ভাই এবং শয়তানের ভাই কখনো সুখী হতে পারে না। এ থেকে বাঁচার জন্যেই ১৪০০ বছর আগে নবীজী (স) বলেছেন, 'আর্থিক চাপমুক্ত বিয়েই স্বর্গসুখসম্ভবা বিয়ে'।

বিয়ের ব্যাপারে নবীজীর (স) নির্দেশিত প্রক্রিয়া যত অনুসরণ করা হবে, বিবাহিত জীবন তত সুখের হবে, তত কল্যাণময় হবে। অতএব বিয়ের জন্যে একটি ভোজের আয়োজন করুন। এই ভোজসভার ব্যাপারেও নবীজী (স) পরিষ্কারভাবে বলেছেন, 'যে বিয়েতে বেছে বেছে শুধু ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয়, সেই ভোজ হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য এবং ঘৃণিত ভোজ'। অতএব বিয়ের ভোজে সবসময় ধনী-গরিব নির্বিশেষে আত্মীয়দের দাওয়াত দেয়া বাঞ্ছনীয়।

আর বিয়ের ক্ষেত্রে কনের সম্মতি ও অভিভাবকের অনুমতি দুটোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিরমিজী শরীফে গ্রন্থিত হাদীসে আছে, কোনো মেয়ে তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে তা বৈধ হবে না। আর বোখারী ও মুসলিম শরীফে গ্রন্থিত হাদীস অনুযায়ী, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তার সম্মতি এবং কুমারী কনের অনুমতি না নিয়ে অভিভাবক তার বিয়ে দিতে পারবেন না।

নবীজী (স) ভুক্তভোগী নারীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিয়ে বাতিল করে দিয়েছেন। যেমন, আনসার সাহাবী খানসা বিনতে খিদামের (রা) আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। তিনি নবীজীর (স) কাছে এসে জানালেন, তার বাবা তাকে বিয়ে দিয়েছেন

কিন্তু এই বিয়েতে তার মত নেই। নবীজী (স) সাথে সাথে এই বিয়েকে বাতিল ঘোষণা করেন।

আয়েশা (রা) নবীজীকে (স) জিজ্ঞেস করলেন যে, এক মেয়েকে তার অভিভাবকরা বিয়ে দিয়েছেন। এই বিষয়ে অভিভাবকদের তার সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল কিনা। নবীজী (স) পরিষ্কার বললেন যে, অবশ্যই মেয়ের অনুমতি নিতে হবে। নবীজী (স) শুধু বলেই ক্ষান্ত হন নি, নিজেও তার মেয়েদের বিয়ে দেয়ার সময় তাদের সম্মতি আছে কিনা তা জেনে নিয়েছেন।

আলী ইবনে আবু তালিব (রা) যখন নবীজীর (স) কাছে ফাতেমাকে (রা) বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে গেলেন, নবীজী তাকে পরিষ্কার বললেন যে, এর আগেও বেশ কয়েকজন তার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে তার চেহারায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে। তোমার প্রস্তাবও আমি অবশ্যই তাকে জানাব।

নবীজী (স) তার মেয়ের কাছে গেলেন এবং আলীর (রা) প্রস্তাব জানালেন। এইবার ফাতেমা (রা) অসম্মতি জানিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেন নি। তিনি মৌন থেকে আনত হয়ে তার সম্মতি প্রকাশ করলেন। নবীজী (স) ফাতেমার কাছ থেকে বেরিয়ে এলেন 'আল্লাহ মহান' ধ্বনি দিয়ে। অর্থাৎ ফাতেমা (রা) আলীর প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহর রসুল (স), যিনি দুনিয়া এবং আখেরাত দুই জগতে মানুষকে সফল হওয়ার দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, তার মতো ব্যক্তি বিয়ের ব্যাপারে যখন কন্যার সম্মতি নেয়ার

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, সেখানে কনের সম্মতি ছাড়া কোনো অভিভাবক কনেকে পাত্রস্থ করার অধিকার রাখেন না। বিয়ের ক্ষেত্রে কুমারীর সম্মতিকে তার এক অলঙ্ঘনীয় অধিকার হিসেবে নবীজী (স) বিবেচনা করেছেন। সেইসাথে বিয়ের ক্ষেত্রে কনের অভিভাবকের অনুমতি নেয়াকেও নবীজী (স) অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন।

গত ৫০ বছরের পর্যবেক্ষণের আলোকে আমরা বলতে পারি, অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া যে কুমারী বিয়ে করেছে, তার জীবনের সাথে কোনো না কোনো গভীর অব্যক্ত বেদনা যুক্ত হয়ে গেছে। অতএব বিয়েকে স্বর্গসুখসম্ভবা করতে হলে বিয়েটা প্রথমত হতে হবে আর্থিক চাপমুক্ত এবং নিতে হবে কনের সম্মতি এবং অভিভাবকের অনুমতি। তাহলেই এটি হবে সোনায় সোহাগা।

আর একজন পুরুষ বিয়ের সময় যতগুলো অঙ্গীকার করে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দেনমোহর। কেননা দেনমোহর পুরোপুরি শোধ না করে স্বামী যদি মারা যায়, পরকালে সে ব্যভিচারী হিসেবে বিবেচিত হবে। সাহাবীরা তাই দেনমোহর আদায়ের ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন।

নবীজী (স) এক সাহাবীর বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের সময় কোনো দেনমোহর ধার্য করা হয় নি। তিনিও স্ত্রীকে পরবর্তীতে কোনো দেনমোহর দেন নি। মৃত্যুশয্যায় তার মনে পড়ল যে, স্ত্রীকে তিনি দেনমোহর দেন নি। উপস্থিত সবাইকে লক্ষ করে সেই সাহাবী বললেন, নবীজী (স) আমাকে আমার স্ত্রীর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাকে কোনো দেনমোহর দেই নি।

তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি দেনমোহর হিসেবে খয়বরে আমার ভাগের অংশ তাকে প্রদান করছি।

ঐ মহিলা স্বামীর মৃত্যুর পর তার দেনমোহরের অংশ এক লক্ষ দিরহামে বিক্রি করে দেন!

তবে প্রত্যেক স্বামীর জন্যে শিক্ষণীয় হচ্ছে যে, দেনমোহর ঠিক করবেন সামর্থ্য অনুসারে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে। ফুটানিতে পড়ে নয়। খেয়াল রাখতে হবে, দেনমোহর যাতে 'জুলুম' না হয়ে যায়। আপনি যতটা আদায় করতে পারবেন, ততটাই দেনমোহর ধার্য করবেন। কনের অভিভাবকরাও সামাজিক ফুটানির জন্যে অযৌক্তিক দেনমোহর চাপিয়ে দেবেন না।

দেনমোহর যাতে জুলুম না হয় এজন্যে নবীজী (স) সবসময়ই সতর্ক ছিলেন। আলী (রা) যখন ফাতেমাকে (রা) বিয়ে করেন, তখন তিনি খুবই দরিদ্র ছিলেন। তার বিয়ের প্রস্তাব মঞ্জুর হওয়ার পর নবীজী (স) প্রথমেই জানতে চাইলেন, মোহরানা হিসেবে দেয়ার মতো কিছু কি তোমার আছে? আলী (রা) বললেন, নেই, ইয়া রসুলুল্লাহ! নবীজী (স) তখন বললেন, তোমাকে যে বর্ম দিয়েছিলাম, সেটা কোথায়? আলী (রা) সেই বর্ম বিক্রি করে পাওয়া ৪০০ দিরহাম মোহরানা হিসেবে ফাতেমার (রা) তুলে দিলেন। বিয়ে হয়ে গেল।

নবীজী (স) কেন আলীকে (রা) তার একমাত্র সম্বল বর্ম বিক্রি করে হলেও দেনমোহর আদায় করতে বললেন? কারণ দেনমোহর আদায় ছাড়া দাম্পত্য সম্পর্ক শুদ্ধ হয় না। অতএব বিবাহিত পুরুষ যারা দেনমোহর শোধ করেন নি, তাদের

অবশ্যই উচিত দাম্পত্য জীবনে শুদ্ধতা দানের জন্যে দেনমোহর পরিশোধ করা। অল্প অল্প করে হলেও দেনমোহর শোধ করা আপনার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি দেনমোহর আদায় বাবদ প্রতি মাসে যদি কোনো অর্থ দিতে হয়, সেভাবে হলেও শোধ করা উচিত।

আর আপনি যদি স্ত্রীর দেনমোহর শোধ করার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে উদ্যোগ নেন, চেষ্টা চালান, আল্লাহ অবশ্যই আপনার ওপর রহমত করবেন। কারণ যে আন্তরিক প্রয়াস চালায় আল্লাহ সবসময়ই তার ওপর রহমত বর্ষণ করেন।

বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষদের আরেকটি বিষয়ে নবীজী (স) সতর্ক করে গেছেন। সেটা হলো, বিয়ের ক্ষেত্রে কোনো নারীর ধনসম্পত্তি, বংশমর্যাদা বা রূপ দেখে কখনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। সিদ্ধান্ত নেবেন তার সৎগুণ দেখে।

অবিবাহিত ব্যক্তি নারী হোন বা পুরুষ, নবীজী (স) যে পরামর্শগুলো দিয়েছেন, তা মেনে বিবাহিত জীবন শুরু করলে সফল হবেন, সুখী হবেন।

স্বামী-স্ত্রী : পারস্পরিক দায়িত্ব

বিশ্বাসীদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ, যে চরিত্রবান ও সদাচারী। তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম পুরুষ, যে স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ করে।

—*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী

তোমরা সাধ্যমতো তোমাদের স্ত্রীর উত্তম ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।

—*আমর ইবনে আল আহওয়াস (রা);* তিরমিজী

সাবধান! স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, একইভাবে স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে তোমাদের ওপর। (পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থেকো)

—*আমর ইবনে আল আহওয়াস (রা);* তিরমিজী

মগ্নপাঠ

সূরা নিসায় পারিবারিক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে সৎভাবে জীবনযাপন করাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সৎ বলতে কথা, কাজ এবং আচরণ সবকিছুতেই আন্তরিকতা। স্ত্রীর প্রতি সমমর্মিতাকে নবীজী (স) কত গুরুত্ব দিয়েছেন, উম্মুল মোমেনিন আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে তা সুস্পষ্ট। নবীজী (স) পরিষ্কারভাবে বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই পুরুষই উত্তম, যে তার স্ত্রীর প্রতি সমমর্মী, আর আমি হচ্ছি এর বাস্তব উদাহরণ'। (তিরমিজী)

নবীজীর (স) দৈনন্দিন জীবন হচ্ছে তার চেতনা, তার আদর্শ ও তার ভাবনার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, নবীজী (স) ফজর নামাজের পরে প্রার্থনাস্থলে বসতেন এবং লোকজন তাকে ঘিরে থাকত সূর্যোদয় পর্যন্ত। তারপর তিনি প্রার্থনার স্থান থেকে বেরিয়ে তার স্ত্রীদের কাছে যেতেন। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কক্ষ ছিল। তিনি এক এক করে প্রত্যেকের কক্ষে যেতেন, তাদের সালাম দিতেন, কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন, তাদের জন্যে দোয়া করতেন। তারপর দিনটি যে স্ত্রীর জন্যে বরাদ্দ, তার ঘরে তিনি যেতেন এবং সেখানে অবস্থান করতেন।

শত ব্যস্ততার মাঝেও মদিনায় যখন তিনি থাকতেন, তখন এটি ছিল তার দৈনন্দিন কাজের অংশ এবং সকালবেলা নামাজ পড়ার পরে প্রথম কাজ। তার এত ইবাদতও কখনো স্ত্রীদের সাথে সময় কাটানোর পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে নি।

আয়েশা (রা) বলেন, ফজর নামাজের আগে নবীজী (স) দু-রাকাত নামাজ পড়তেন। আমি যদি ততক্ষণে ঘুম থেকে উঠে যেতাম, তাহলে তিনি আমার সাথে গল্প করতেন। যদি আমি ঘুমিয়ে থাকতাম, তাহলে তিনি ফজরের নামাজের আগপর্যন্ত শুয়ে থাকতেন।

নবীজী (স) তার জীবনের প্রথম নারী খাদিজার (রা) প্রতি ভালবাসা সবসময়ই অটুট রেখেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, যখনই আল্লাহর রসুল খাদিজার নাম উল্লেখ করতেন, তিনি তার প্রশংসা করতেন এবং তারপর খাদিজাকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে আল্লাহর কাছে তিনি দোয়া করতেন। খাদিজার প্রশংসার ব্যাপারে তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না।

নবীজী (স) কখনো তার স্ত্রীদের কারো গায়ে হাত তোলেন নি। আয়েশা (রা) বলেন যে, আল্লাহর রসুল কোনো খাদেম, কোনো দাস বা কোনো মহিলার গায়ে কখনো হাত তোলেন নি। নবীজী (স) সবসময় এমনকি বিদায় হজের ভাষণেও নারীদের সাথে, স্ত্রীর সাথে সদয় সমমর্মী আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি তার স্ত্রীদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি কতটা সমমর্মী ও যত্নশীল ছিলেন, উম্মুল মোমেনিন সাফিয়্যার (রা) ঘটনা থেকে আমরা তা বুঝতে পারি।

সাফিয়্যা (রা) বলেন, আমরা নবীজীর (স) সাথে ভ্রমণ করছিলাম। আমার উট অসুস্থ হয়ে বসে পড়ল এবং বাহন হিসেবে আমার উটটি ছিল সবচেয়ে ভালো। উটের এই অবস্থা দেখে আমি কাঁদতে শুরু করলাম। নবীজীর (স) কাছে খবর

গেলে তিনি আমার কাছে এলেন এবং নিজের দুহাত দিয়ে আমার চোখের অশ্রু মুছে দিতে শুরু করলেন।

আসলে কোনো স্বামী যখন তার স্ত্রীর চোখের অশ্রু মুছে দেন, তা যে সেই নারীকে কতটা স্বস্তি, কতটা আনন্দ দেয় এবং স্বামীর প্রতি আবেগ-অনুভূতির কতটা প্রকাশ ঘটায় এটা অনেকেই বোঝে না। এ-ক্ষেত্রে সাফিয়্যার (রা) কান্নার কারণ যদিও খুব বড় কিছু ছিল না। নবীজী (স) তবুও স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা মমতা সমমর্মিতা প্রকাশে কোনো কার্পণ্য করেন নি।

উম্মুল মোমেনিন আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আল্লাহর রসুল (স) যখন ঘরের ভেতরে থাকতেন, তখন তিনি কী করতেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন—রসুলুল্লাহ (স) তার স্ত্রীদের ঘরোয়া কাজে সাহায্য করতে ব্যস্ত থাকতেন। আর যখন নামাজের সময় হতো তিনি মসজিদে নামাজে চলে যেতেন।

নবীজী (স) সমস্ত অনুমোদিত ব্যাপারে স্ত্রীদের অনুরোধ রক্ষা করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, একদিন নবীজী আমার সাথে বসে ছিলেন। হঠাৎ বাইরে থেকে উচ্চস্বরে শোরগোল শোনা গেল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কী হচ্ছে দেখার জন্যে বাইরে গেলেন এবং দেখলেন তেমন কিছু নয়। তরুণরা বর্শা নিয়ে খেলছে। তিনি ঘরে ফিরে আমাকে বললেন, আয়েশা, তুমি কি বাইরে গিয়ে তাদের এই বল্লম খেলা দেখতে চাও?

আমি সেখানে গেলাম এবং তার কাঁধের ওপর চিবুক রেখে খেলা দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, খেলা দেখে তুমি কি তৃপ্ত? আমি খেলা দেখতে থাকলাম এবং

অনেকক্ষণ পরে খেলা দেখা বন্ধ করলাম এবং উঠে ফিরে এলাম। আমি নিজে না ওঠা পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেছিলেন।

ঘটনাগুলো ছোট। কিন্তু প্রতিটি ঘটনাই বলে দেয় যে, নবীজী (স) তার স্ত্রীদের ব্যাপারে কত যত্নশীল ছিলেন, কত সমমর্মী ছিলেন।

সূরা নিসার ৩৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, 'নারীর যত্ন নেয়ার পুরো দায়িত্ব পুরুষের। আল্লাহ পুরুষকে যে অতিরিক্ত অনুগ্রহ-সম্পদ ও আর্থিক সামর্থ্য দিয়েছেন, তা দিয়ে সে নারীর পুরো যত্ন নেবে।'

নবীজীর (স) জীবনাচারের দিকে তাকালে আমরা দেখব যে, স্বামী হিসেবে তিনি সবসময়ই স্ত্রীদের প্রতি সর্বাত্মকভাবেই যত্নশীল ছিলেন। আমরাও যদি আমাদের জীবনে সূরা নিসার এই আয়াতের আন্তরিক প্রতিফলন ঘটাতে পারি এবং নবীজীর (স) পদাঙ্ক অনুসরণ করি তাহলে কোনো স্ত্রী নিজেকে অবহেলিত মনে করার, অসম্মানিত মনে করার, মানসিকভাবে পরিত্যক্ত মনে করার কোনো সুযোগ কখনো পাবে না। আমাদের পরিবারগুলো তখন স্বর্গসুখপ্রসবা হয়ে উঠবে।

প্যারেন্টিং

তোমরা তোমাদের সন্তানের জন্যে
সুন্দর নাম রাখো।

—*আবু দারদা (রা);* আবু দাউদ

শুদ্ধাচার শিক্ষাদান সন্তানের প্রতি
পিতার সর্বোত্তম উপহার।

—*আইয়ুব ইবনে মুসা (র);* তিরমিজী, মেশকাত

তুমি কি চাও তোমার সন্তানেরা সবাই তোমাকে সমভাবে সম্মান করুক? যদি চাও, তবে তাদের কারো প্রতি অবিচার কোরো না। যে-কোনো উপহারসামগ্রী তাদের সমভাবে দান করো। উপহারের ক্ষেত্রে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব কোরো না।

—*নোমান ইবনে বশীর (রা);* বোখারী, মুসলিম

পোষ্যদের ভরণপোষণ ও লালনপালনে অবহেলা করাই একজন মানুষের পাপী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

—*আবদুল্লাহ (রা);* বায়হাকি

মগ্নপাঠ

সন্তান লালনের ক্ষেত্রে করণীয়-বর্জনীয়ের ব্যাপারে আলোচনা করার আগে সন্তান সুসন্তান ও শুদ্ধাচারী না হলে পিতার পরিণতি কী হতে পারে তার একটি উদাহরণ দেই।

ঘটনাটি ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসের। এক অশীতিপর বৃদ্ধ মারা গেছেন। তার প্রথম পক্ষের ছয় মেয়ে। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে দুই ছেলে দুই মেয়ে। দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানেরা তার কাছ থেকে ১৪০ শতক জমি দলিল করে নিজেদের নামে লিখে নেয়। এটা নিয়ে প্রথম পক্ষের সন্তানদের সাথে বিরোধ চলছিল। বিরোধ মীমাংসা হওয়ার আগেই তিনি ঢাকার একটি হাসপাতালে মারা গেলেন।

হাসপাতাল থেকে লাশ বাড়িতে পৌঁছলে সম্পত্তির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে প্রথম পক্ষের ছয় মেয়ে গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে দাফনে বাধা দেয়। তাদের বক্তব্য হলো, সম্পত্তির সুষ্ঠু ভাগ-বাটোয়ারা না হওয়া পর্যন্ত দাফন করা যাবে না।

দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানরাও সাফ জানিয়ে দিল, তারা অন্য পক্ষকে কোনো সম্পত্তি দেবে না। প্রবাসে অবস্থানরত দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে মোবাইল ফোনে গ্রামবাসীকে বলল, বাবার লাশ দাফনের দরকার নেই। আমরা কাউকে এক শতক সম্পত্তিও দেবো না।

দুই দিন সেই বৃদ্ধের লাশ ঘরের সামনেই পড়েছিল। দুদিন পর পুলিশ গিয়ে সালিশ বসায়। সালিশে ছয় বোনকে ১৪ শতক জমি দিতে রাজি হয় দ্বিতীয় পক্ষ। এরপর পুলিশের

উপস্থিতিতে বৃদ্ধের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়।

ঘটনাটা হৃদয়বিদারক। সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে সন্তানরা বাবার লাশ ফেলে রাখল দুদিন। কিন্তু যদি আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি, এমন অমানবিক আচরণের দায়ভার কি কেবল সন্তানদেরই? দায়ভারের একটা বড় অংশ মা-বাবার ওপরেও কি বর্তায় না?

মা-বাবা যদি ছোটবেলা থেকে সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা দিতেন, শুদ্ধাচারী হওয়ার শিক্ষা দিতেন, সত্যিকার ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন, ধর্ম যে ন্যায়বিচারের কথা বলে, অন্যায় থেকে দূরে থাকার কথা বলে—এই শিক্ষা দিতেন; যদি শিক্ষা দিতেন যে, প্রথম পক্ষের মেয়েরাও তারই সন্তান, তাদেরকেও তার উত্তরাধিকারী হিসেবে ন্যায্য হিস্যা দেয়া দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেদের প্রধান নৈতিক দায়িত্ব, শুধু ইহকালের সাফল্য নয়, অন্যায়ের পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে যদি শিক্ষা দিতেন, তাহলে হয়তো-বা মৃত্যুর পর পিতার লাশ দুইদিন ঘরের সামনে পড়ে থাকত না।

নবীজী (স) বলেছেন যে, 'শুদ্ধাচার শিক্ষাদান সন্তানের জন্যে পিতার সর্বোত্তম উপহার'। পিতা যদি সর্বোত্তম উপহার সন্তানদের দিতেন, তাহলে হয়তো পিতাকে এই করুণ পরিণতির সম্মুখীন হতে হতো না।

সন্তানকে এখনকার মা-বাবা সবকিছুই দেন। তাদের পুতুল দেন, কম্পিউটার দেন, স্মার্টফোন দেন, অর্থবিত্ত দেন, খরচ করার জন্যে প্রচুর হাতখরচ দেন। কিন্তু নৈতিক শিক্ষা, শুদ্ধাচারী হওয়ার শিক্ষা, সত্যিকার ধর্মীয় শিক্ষা থেকে তাকে

মা-বাবা হয় বঞ্চিত রাখেন অথবা এই শিক্ষার যে আদৌ প্রয়োজন আছে সেটাই তারা অনুভব করেন না। ভুক্তভোগী মা-বাবা যখন এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন, ততক্ষণে অনেক অনেক দেরি হয়ে যায়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে তাকে শুদ্ধাচারী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে কী করতে হবে সেটা নবীজী (স) সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন। নবীজী (স) তার নাতি হাসান (রা) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আজান দিয়েছিলেন।

জন্মগ্রহণ করার পরই নবাগত সন্তানের কানে পৌঁছা প্রথম শব্দটি আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই শব্দের অনুরণন নবজাতকের ভেতরে একটা অন্তঃঅনুরণনের সৃষ্টি করে। শব্দের অর্থ সে বুঝুক অথবা না বুঝুক। এই শব্দটি শিশুর স্মৃতিতে গেঁথে যায়।

বড় হতে হতে প্রথম শোনা সেই শব্দ যখন সে আবার শোনে, যখন শব্দটির অর্থ বোঝে, তখন এই শব্দের প্রতি তার একটা আলাদা মমতা সৃষ্টি হয়। অতএব সন্তানকে শুদ্ধাচারী করার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই তার কানে আজানের বাণী—'আল্লাহ মহান' 'আল্লাহু আকবর' এই ধ্বনি পৌঁছে দেয়া।

নবীজী (স) বলেছেন, সন্তানের শুভাগমনে পিতা-মাতার প্রথম কাজ হচ্ছে নবজাতকের সুন্দর নাম রাখা। অর্থাৎ নামটা অর্থবহ হতে হবে। যে গুণে তাকে আপনি গুণান্বিত করতে চান, সেই গুণের সাথে নামটা সাযুজ্যপূর্ণ হতে হবে। আর একটাই নাম রাখবেন। যে নামে সে পরিচিত হবে, যে নামে

আপনি ডাকবেন। আমরা অধিকাংশ সময়ই ভালো নাম বলে একটা সুন্দর নাম রাখি, অর্থবহ নাম রাখি। আর ডাকনাম বলে নানান রকম অর্থহীন নাম রাখি। খেদি, বোঁচা, বল্টু, বুড়ি—কতরকম অর্থহীন নাম যে রাখি, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। ভালো নামে খুব কমই ডাকা হয়। ডাকনামেই সে পরিচিত হয়ে যায় এবং এই অসুন্দর নামের প্রভাবটাই তার জীবনে পড়ে। এজন্যে মা-বাবার প্রথম অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, সন্তানের জন্যে একটা অর্থবহ নাম রাখা।

আর সন্তানকে শুদ্ধাচারী করার জন্যে তাকে ভালো ভালো কথা শোনানো, ধর্মবাণী শোনানো গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে ভালো হয়, সন্তান গর্ভে আসার পর থেকেই হবু মা যদি সবসময় ভালো কথা শোনেন, ভালো কথা বলেন, ধর্মবাণী শোনেন, অটোসাজেশন শোনেন।

তাহলে ভ্রূণ অবস্থা থেকেই সে মায়ের এই ভালো চিন্তা, ভালো গুণ, ভালো কথা শোনার অভ্যাস দিয়ে প্রভাবিত হবে। ছোটবেলা থেকেই সে বুঝুক না বুঝুক, ভালো কথা নিঃসন্দেহে তার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সন্তানকে ঘুম পাড়ানোর সময় কোলে নিয়ে হোক বা বিছানায় শোয়া অবস্থায় মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে হোক, তাকে ভালো কথা শোনান। ভবিষ্যতে আপনি তাকে যে গুণে গুণান্বিত দেখতে চান, সেই গুণগুলোর কথা যদি বার বার বলেন, বড় হয়ে তুমি এই হবে, এই হবে; তার অবচেতনে সেই কথাগুলো গেঁথে যাবে। তাকে শুদ্ধাচারী হিসেবে গড়ে তোলা তখন আপনার জন্যে খুব সহজ হবে। কারণ যখন সে

বড় হচ্ছে, তার ব্রেন যখন আস্তে আস্তে পরিপূর্ণতা পাচ্ছে, তখন সে ইতিবাচক কথামালার মধ্য দিয়েই বেড়ে উঠবে এবং একথাগুলো তার মনের গভীরে রেখাপাত করবে।

প্রিয় সুহৃদ, সন্তান লালনের ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষেরই মূল ত্রুটি হচ্ছে পক্ষপাতিত্ব। অনেক ক্ষেত্রেই এক সন্তানকে অন্য সন্তানদের চেয়ে বেশি আদর করা, তাকে অনেক কিছু দিতে গিয়ে অন্যদেরকে বঞ্চিত করা।

পক্ষপাতিত্ব সবচেয়ে বেশি করা হয় পুত্র ও কন্যার মধ্যে। পিঠাপিঠি ভাইবোন। বোন দেখছে তার ভাইকে কোলে তুলে নিলেও তাকে কোলে নেয়া বা আদর করার ব্যাপারে মা-বাবা ততটা আগ্রহী না। খেতে বসলে মুরগির রান, মাছের ভালো অংশ, দুধের সর সবই যেন ভাইয়ের জন্যে বরাদ্দ। ভাইয়ের লেখাপড়ার পেছনে মা-বাবা যত মনোযোগ দেন বা খরচ করেন, তার ক্ষেত্রে সেটা থাকে না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে তবে অধিকাংশ পরিবারের চিত্র এটাই। শুধু এখন নয়, আবহমান কাল থেকে এই চিত্রই বাস্তব।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী (স) স্পষ্টভাবে বলেছেন, ‘তোমার কন্যাসন্তানকে যদি তুমি জীবন্ত কবর না দাও, তাকে অবহেলা না করো, তার ওপর ছেলেদের অগ্রাধিকার না দাও, তাকে স্নেহ-মমতা ও মর্যাদার সাথে লালন করো, তবে তুমি এই কন্যার জন্যেই জান্নাতে প্রবেশ করবে’।

অর্থাৎ কন্যাশিশুর ওপর ছেলেসন্তানের অগ্রাধিকার না দিয়ে স্নেহ-মমতা মর্যাদার সাথে লালন করলে এই কন্যার জন্যেই লালনকারী পিতা-মাতা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আর বর্তমানকালে কন্যা ভ্রূণহত্যা আসলে কন্যাকে জীবন্ত কবর দেয়ার শামিল। নবীজী (স) সবসময়ই কন্যাসন্তানের প্রতি এই বৈষম্যকে তিরস্কার করেছেন।

আল বাজ্জারে গ্রন্থিত, আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবীজীর সামনে একজন সাহাবী বসে ছিলেন। তার পুত্রসন্তান তার কাছে এলো। সাহাবী পুত্রসন্তানকে চুমু দিলেন এবং তার কোলে বসালেন। কিছুক্ষণ পরে তার মেয়ে এলো। মেয়েকে তিনি তার সামনে বসালেন। আল্লাহর রসুল (স) তাকে প্রশ্ন করলেন, কেন তুমি তাদের সাথে এই বৈষম্যমূলক আচরণ করলে? কেন তুমি তাদের সাথে সম-আচরণ করলে না? এই ঘটনাটি ইমাম আল হায়সামি তার হাদীসগ্রন্থ *মাজমা আল জাওয়াইদ*-এ উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন করতে পারেন যে, নবীজী (স) কেন এই মানুষটিকে তিরস্কার করলেন। কারণ মা-বাবার বৈষম্যমূলক আচরণ বঞ্চিত সন্তানের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং এর পরিণতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব করুণ হয়ে থাকে। এজন্যে সবসময় ছেলে এবং মেয়ের সাথে সুবিচার ও সম-আচরণ করতে হবে। আপনি যদি চান যে, আপনার সব সন্তান আপনাকে সমান সম্মান করুক, তাহলে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সবার সাথে সুবিচার করতে হবে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে গ্রন্থিত হাদীসে নবীজী (স) বলেন, 'তুমি কি চাও তোমার সন্তানেরা সবাই তোমাকে সমভাবে সম্মান করুক? যদি চাও তবে তাদের কারো প্রতি অবিচার কোরো না। যে-কোনো উপহারসামগ্রী তাদের

সমভাবে প্রদান করো। উপহারের ক্ষেত্রে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব কোরো না'।

সব কথার আসল কথা হচ্ছে, যদি আপনি আপনার সন্তানকে শুদ্ধাচারী করতে চান, তাহলে প্রথমে আপনাকে শুদ্ধাচারী হতে হবে। সন্তানের মধ্যে আপনি যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ দেখতে চান, সেই দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ আগে আপনাকে আয়ত্ত করতে হবে।

আপনি যদি নিজে ধূমপান করেন, আপনি যদি স্মার্টফোন বা গেমে আসক্ত হন, আর সন্তানকে যদি বলেন ধূমপান করবে না বা স্মার্টফোনে আসক্ত হবে না, সন্তান কখনোই তা শুনবে না। এটা যে শুধু আধুনিককালের মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন তা কিন্তু নয়। দ্বাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট আলেম ইমাম ইবনে আসাকির তার ৩৭ খণ্ডের বিশাল গ্রন্থ *তারিখ-ই-দামাস্ক* বা দামেস্কের ইতিহাসে পরামর্শ দিয়েছেন যে, সন্তানকে শুদ্ধাচারী করতে হলে আপনি যে চিন্তায় তাকে লালিত করতে চান, প্রথমে আপনার নিজেকে সে চিন্তায় লালিত করতে হবে। কারণ আপনার ভুল দ্বারাই সন্তান প্রভাবিত হবে।

কেননা সন্তানের চোখে ভালো হচ্ছে সেটা, যা আপনি করেন। আর খারাপ হবে সেটা, যা থেকে আপনি বিরত থাকেন। অর্থাৎ আপনি যে কাজগুলো করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখতে পারবেন, সন্তানও তা থেকে নিবৃত্ত থাকবে।

আর যে কাজগুলো আপনি আনন্দচিত্তে করবেন, সন্তানও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই কাজগুলোর মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাবে। এটাই হচ্ছে সন্তান বিকশিত হওয়ার স্বাভাবিক ধারা।

তাই যখনই মেডিটেশন করবেন, সন্তানের জন্যে দোয়া করবেন। সন্তানকে সাদাকায়নে নিয়ে যাবেন এবং পরিবারে সপ্তাহে অন্তত একদিন ধ্যানে, আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী, হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী এবং শুদ্ধাচার বই নিয়ে পারিবারিক পাঠচক্রে সন্তানকে নিয়ে সবাই মিলে আনন্দ-উচ্ছলতায় মেতে থাকবেন।

আসলে যত হাসিখুশি আনন্দের মধ্য দিয়ে শাশ্বত সত্যের বাণী, নৈতিকতার বাণী, ধর্মের বাণী, শুদ্ধাচারের বাণী সন্তানের কাছে পৌঁছাতে পারবেন, যত নিজে শুদ্ধাচারী হবেন, সন্তানও তত নৈতিক গুণে গুণান্বিত ও শুদ্ধাচারী হয়ে গড়ে উঠবে।

আত্মীয় ও প্রতিবেশী

তোমার মাতা, তোমার পিতা, তোমার বোন, তোমার ভাই, তোমার মুক্ত করা দাস, তোমার নিকটাত্মীয়—এরা সবাই তোমার সমমর্মিতার হকদার। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় মনোযোগী থাকবে। এটা তোমার কর্তব্য।

—*কুলাইব ইবনে মানফা (র);* আবু দাউদ

স্বজন-পরিজন-সুজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষাকারীর আয়ু যেমন বাড়ে, তেমনি প্রবৃদ্ধি ঘটে উপার্জনে।

—*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হলে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলো। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা গুরুতর পাপ।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, রিয়াদুস সালেহীন

আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করলে প্রতিবেশীকে কষ্ট দিও না, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করো। মেহমানদের আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করো।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম, মুফরাদ

মগ্নপাঠ

নবীজী (স) বলেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় মনোযোগী থাকবে। এটা তোমার কর্তব্য'। তাঁর বাণী থেকে পরিষ্কার যে, মা-বাবা, ভাই-বোন নিকটাত্মীয়ের প্রতি সমমর্মিতা আপনার দয়া নয়, আপনার কাছ থেকে সমমর্মিতা পাওয়াটা তাদের ন্যায্য অধিকার।

নবীজীর (স) জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখব যে, সমমর্মিতার এই হক আদায়ে তিনি সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল মুত্তালিব ইবনে রাবিয়া (রা) বলেন যে, নবীজী (স) সবচেয়ে কর্তব্যপরায়ণ মানুষ ছিলেন এবং তিনি আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রেখে সর্বসমক্ষে সম্মানজনকভাবে উপস্থাপনের সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে আছেন। নবীজী (স) যখন ক্ষমতা ও বিজয়ের তুঙ্গে অবস্থান করছিলেন, তখনকার একটি ছোট্ট ঘটনা বলে দেয় আত্মীয়ের প্রতি, মানুষের প্রতি তার সমমর্মিতা কত গভীর ছিল।

হুনাইনের যুদ্ধে প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে মুসলিম বাহিনী হাওয়াজিনদের বিরুদ্ধে যখন পুরোপুরি বিজয়ী হলো, যুদ্ধবন্দিদের জড়ো করা হলো। তাদের মধ্যে একজন বয়স্ক মহিলা ছিলেন। বন্দি সেই বয়স্ক মহিলা বার বার দাবি করছিলেন যে, আমি তোমাদের নেতা মুহাম্মদের আত্মীয়।

আটককারী সৈনিকরা হয়তো তার কথায় মজা পাচ্ছিল যে, এই বেদুইন মহিলা তাদের নবীর আত্মীয় বলে দাবি করছে। তারা মনে করেছিল, তার প্রতি যাতে দয়া প্রদর্শন করা হয়

সেটারই একটা করুণ আবেদন হিসেবে সে আত্মীয়তার দাবি করছে। কিন্তু এই মহিলা বার বার বলতে লাগল, আমাকে তোমাদের নেতা মুহাম্মদের কাছে নিয়ে চলো।

আটককারীরা যখন তাকে তার গোত্রের লোকজন-সহ নবীজীর (স) সামনে হাজির করল তখন সে সরাসরি বলল, হে আল্লাহর রসুল! আমি শায়মা। তোমার দুধবোন। যখন শিশুকালে তুমি আমাদের গোত্রে ছিলে, তখন আমি তোমার দেখাশোনা করেছি।

নবীজী (স) হয়তো ভাবলেন, এ কী সম্ভব! এটা কি হতে পারে? তার সাথে শেষ দেখা হওয়ার পর ৫৫ বছর পার হয়ে গেছে। তিনি মনে করতে পারলেন যে, এই নারীর গোত্র বনু সাদ হাওয়াজিনদের একটা অংশ। কিন্তু সাদা চুলের ভঙ্গুর দেহের এই বৃদ্ধা কি আসলেই সেই কিশোরী?

তিনি সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যে শায়মা, তার প্রমাণ কী। উত্তরে সেই বৃদ্ধা তার হাতের কাপড় সরিয়ে হাতের উপরের অংশ দেখিয়ে বলল, আমি যখন অদিসারারে তোমাকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তুমি এখানে কামড় দিয়েছিলে। সেই কামড়ের দাগ এখনো রয়েছে।

ঘটনা সত্যি। তার দুধমা হালিমার বড় মেয়ের কোলেপিঠে তিনি বড় হয়েছেন। তার দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি জোর করে থামানোর জন্যে, তাকে নিরাপদে রাখার জন্যে কিশোরী বয়সে এই মহিলা সবসময় চেষ্টা করেছে। আর আজকে সে তার কাছে দয়া ভিক্ষা চাচ্ছে। যিনি যুদ্ধবিগ্রহ হানাহানি সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করতেন, সমমর্মী সেই রসুলের (স) মনে হয়তো

প্রশ্ন জেগেছিল, এই কি যুদ্ধ ও বিজয়ের পরিণতি? কখন এসব শেষ হবে? ছোটবেলার স্মৃতি হয়তো ভীড় করছিল সেই মহামানবের অন্তরে, যিনি তখন আরবের প্রধান হিসেবে সর্বত্র স্বীকৃত। তিনি আবারও বুঝতে পারলেন, কালস্রোতে কত অসাধারণ দূরত্ব অতিক্রম করেছেন তিনি। অশ্রু সামলে নিয়ে উপস্থিত সবাইকে হতবাক করে দিলেন তিনি। নিজের গায়ের চাদর পাশে বিছিয়ে দিলেন।

শায়মাকে আহ্বান জানালেন তার পাশে বসার জন্যে। কিছু স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি শায়মাকে বললেন যে, তুমি সমস্ত মর্যাদা এবং মমতাসহ আমার সাথে থাকতে পারো অথবা তুমি তোমার গোত্রের সেই ভূমিতে পরিজনদের নিয়ে ফিরে যেতে পারো। যা তুমি হারিয়েছ, যাওয়ার সময় ক্ষতিপূরণ হিসেবে উট ও গবাদি পশুর পাল থেকে তোমার ইচ্ছেমতো উট ও গবাদি পশু নিয়ে যেতে পারো।

শায়মা প্রকৃত বেদুইন ছিল। মরূদ্যানে বাস করার চেয়ে মরুভূমিতে ফিরে যাওয়াকেই সে শ্রেয় মনে করল। শায়মা ইচ্ছেমতো উট গবাদি পশু নিয়ে পরিজনদের সাথে ফিরে গেল তার আবাসভূমিতে।

একজন মানুষ কতটা সমমর্মী হলে, কতটা শোকরগোজার হলে, ক্ষমতার তুঙ্গ অবস্থায় পৌঁছে ৫৫ বছর আগের সেই স্মৃতি মনে করে একজন সাধারণ বৃদ্ধা বন্দির সাথে এত সমমর্মী আচরণ করতে পারেন! বিজিতের সাথে বিজয়ী সেনাপতি, সম্রাট বা রাষ্ট্রপ্রধানের এত সম্মানজনক আচরণের নজির ইতিহাসে বিরল।

আমাদের সমাজে অনেক ছেলেমেয়ে আছে, দুর্দশাগ্রস্ত আত্মীয় তো দূরের কথা, যে বাবা তার জায়গা-জমি বিক্রি করে তাকে পড়াশোনা করিয়েছেন, অফিসের কর্তা হওয়ার পরে সেই বাবা যখন খোঁজখবর নিয়ে তার সাথে দেখা করতে এসেছেন, তখন জন্মদাতাকে বাবা হিসেবে নয়, বাড়ি থেকে আসা চাকর হিসেবে সহকর্মীদের সামনে বর্ণনা করছে।

এই যখন আধুনিক শিক্ষিত মানুষের একটি অংশের অবস্থা, তখন আত্মীয়ের প্রতি, দূরবর্তী আত্মীয়ের প্রতি এই সমমর্মী আচরণ আসলে সবকালের জন্যেই দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

সাহাবী, তাবেঈ এবং তাবে তাবেঈনরা নবীজীর (স) সুন্নাহ অনুসারে প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন।

একদিন আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বাসায় ফিরে দেখলেন যে, পরিবারের জন্যে একটা ভেড়া জবাই করা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, এখান থেকে আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে কি কিছু দেয়া হয়েছে? আমি নবীজীকে (স) বলতে শুনেছি, জিবরাইল প্রতিবেশীদের যত্ন নেয়ার জন্যে তাঁকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। উপদেশ শুনতে শুনতে একসময় তাঁর মনে হলো এরপর জিবরাইল হয়তো বলবেন, প্রতিবেশী সম্পত্তিরও উত্তরাধিকার হবে। একথা মনে হওয়ার পরে জিবরাইল থামলেন।

ইমাম গাজ্জালী (র) তাই *এহিয়া উলুমুদ্দিন*-এ লিখেছেন, 'প্রতিবেশীর সাথে সবসময় সুন্দর, ভদ্র আচরণ করতে হবে। তাকে আগে সালাম দিতে হবে। সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে

যেতে হবে। তার দুর্যোগে, তার বিপদে তাকে সান্ত্বনা দিতে হবে। তার আনন্দে, তার অর্জনে তাকে অভিনন্দন জানাতে হবে। তার সুখের সাথি হতে হবে। প্রতিবেশীর ভুলগুলোর দিকে না তাকিয়ে তার গুণগুলোর দিকে তাকাতে হবে। তার বাড়ির মহিলাদের দেখতে হবে সম্মানের দৃষ্টিতে। তার অনুপস্থিতিতে তার ঘরের সুরক্ষা দিতে হবে। প্রতিবেশীর সন্তানের প্রতি সদয় হতে হবে। ধর্মীয় আত্মিক আধ্যাত্মিক বা পার্থিব কোনো বিষয়ে যদি তার জ্ঞানের অভাব থাকে, তাহলে তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে হবে।'

প্রতিবেশীর সাথে আচরণের যে গাইডলাইন ইমাম গাজ্জালী দিয়েছেন, তার বাস্তব উদাহরণ পাই ইমাম আবু হানিফার জীবন থেকে। ছোট্ট ঘটনা।

তার প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন ছিল খ্রিষ্টান। পেশায় সে মুচি। প্রতিরাতে সে মাতাল হয়ে হইহল্লা করত, বউকে পেটাত। আর ইমাম সাহেব রাত জেগে ইবাদত করতেন, জ্ঞানচর্চা করতেন। তার বেশ অসুবিধা হলেও কখনো সেই মুচিকে ডেকে ধমকাধমকি করেন নি। কিন্তু মহল্লার লোকজন মুচির মাতলামিতে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন ইমাম সাহেবের কাছে এলো। মুচির বিরুদ্ধে অভিযোগ করল।

ইমাম সাহেব আর কী করেন! প্রতিবেশী মুচিকে ডাকলেন। তাকে উপদেশ দিলেন যে, মদ খাওয়া ভালো না। মদ খেও না। মুচি কসম কেটে বলল, হুজুর, কখনো খাব না। মাতালরা যখন হুঁশে থাকে, তখন তার চেয়ে সুবোধ আর কেউ হয় না। আর যখন মাতাল হয়, তখন তার চেয়ে বেহুঁশও আর কেউ

হয় না। কয়েকদিন সব ঠিকঠাক। তারপর আবার সেই হইহল্লা। বউ পেটানো। কিছুদিন পর হঠাৎ সব একদম শান্ত।

ইমাম সাহেব মনে মনে ভাবলেন, যাক, উপদেশে কাজ হয়েছে। পরদিন ইমাম আবু হানিফা (র) ফজরের নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। প্রতিবেশী মুচির বাড়ির কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার কানে এলো মহিলার ডুকরে কান্নার আওয়াজ। দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মা, কী হয়েছে? বাড়ির ভেতর থেকে উত্তর এলো, হুজুর, আমার স্বামীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে অনাহারে আছি। ঘরে খাবার-দাবার নেই।

ইমাম আবু হানিফা (র) যিনি এত বড় ইমাম, মসজিদের দিকে না গিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন। স্ত্রীকে প্রতিবেশীর বাসায় খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বলে মসজিদে রওনা দিলেন।

আসল ঘটনা ছিল এই যে, অন্যান্য প্রতিবেশীরা যখন দেখল ইমাম সাহেবকে বলে কোনো কাজ হচ্ছে না, তখন তারা কুফার গভর্নরের কাছে নালিশ করল। পুলিশ এসে মুচিকে ধরে নিয়ে গেল। যে ইমাম আবু হানিফা কখনো নিজের কোনো প্রয়োজনে গভর্নরের দরবারে যান নি, বেলা উঠলে তিনি গভর্নরের দরবারে উপস্থিত হলেন।

গভর্নর তো ইমাম সাহেবকে দেখেই তার আসন ছেড়ে পড়ি মরি করে দৌড়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কষ্ট করে এসেছেন? আমাকে বললে তো আমিই হাজির হতাম! হুজুর, আপনার কী কাজে আমি আসতে পারি? ইমাম সাহেব বললেন, আমার কোনো উপকারের প্রয়োজন নেই। তোমার পুলিশ

আমার প্রতিবেশীকে ধরে এনেছে। হয় তাকে ছেড়ে দাও, নয়তো তার পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করো।

গভর্নররা সাধারণত রাজনীতি কূটনীতিতে দক্ষ হন। তিনি দেখলেন, ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার চেয়ে এই মাতাল মুচিকে ছেড়ে দেয়া সহজ। ইমাম আবু হানিফা (র) মাতাল প্রতিবেশীকে নিয়ে ফিরে এলেন।

নবীজী (স) আত্মীয় এবং প্রতিবেশীর হক সবসময় আদায় করেছেন। তাদের সবসময় সম্মান করেছেন। তাঁর সাহাবীরা, পরবর্তীতে তাবে তাবেঈন ও ইমামরা একই ধারা অনুসরণ করেছেন। নবীজী (স) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, আল্লাহর শপথ, যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে বিশ্বাসী নয়।

আপনি পুরুষ হোন অথবা নারী, যত নামাজ-রোজা করেন, যত দান-সদকা করেন, যদি আপনার আচরণে, আপনার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে আত্মীয়-প্রতিবেশীরা জর্জরিত হয়, আপনার দ্বারা যদি তাদের অনিষ্ট হয়, তাহলে ঘোর পাপী হওয়ার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট।

প্রতিবেশী যদি খারাপ আচরণ করে, তবুও আপনি তার সাথে ভালো আচরণ করবেন। কেননা নবীজী (স) খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন, আত্মীয় প্রতিবেশীরা তোমাকে যত কষ্ট দিক, তুমি তাদের সাথে ভালো আচরণ করবে এবং যতদিন পর্যন্ত তুমি তোমার এই ভালো আচরণ ঠিক রাখবে, ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন এবং তাদের সকল চক্রান্ত থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন।

শপথ অভিশাপ

মিথ্যা শপথ করে যদি তুমি কারো খুব সামান্য ধনসম্পত্তিও আত্মসাৎ করো, তবে মহাবিচার দিবসে তুমি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। বঞ্চিত হবে জান্নাত থেকে।

—*আবু উমামা আয়াস ইবনে সালাবা (রা);* মুসলিম

কোনো বিশ্বাসীকে লানত বা অভিশাপ দেয়া তাকে খুন করার সমান অপরাধ।

—*সাবিত ইবনে দাহাক (রা);* বোখারী, মুসলিম

যখন কেউ কাউকে বা কোনোকিছুকে অভিশাপ দেয়, তখন অভিশাপ যাকে দেয়া হলো, সে তা পাওয়ার জন্যে যথার্থ বলে বিবেচিত না হলে তা অভিশাপদাতার ওপরই আপতিত হয়। (বুমেরাং-এর মতো ফিরে আসে।)

—*আবু দারদা (রা);* আবু দাউদ

মজলুমের অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ো না। মজলুমের প্রার্থনা সরাসরি আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। আর আল্লাহ কারো ওপর অত্যাচার অনুমোদন করেন না।

—*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* মেশকাত

মগ্নপাঠ

আমাদের অনেকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে এই শপথ অভিশাপ যে পরিমাণ জটিলতা সৃষ্টিকারী ও কষ্ট সঞ্চারক হয়, অন্য অনেক কিছুই এর ধারে-কাছে যেতে পারে না।

অধিকাংশ সময়ই আমরা শপথ অভিশাপ করি আবেগবশত, রাগ বা ক্রোধবশত বা ঘৃণাবশত। কারো আচরণ বা কোনো ঘটনায় আপনি আবেগপ্রবণ বা উত্তেজিত হয়ে এমন কিছু কথা উচ্চারণ করে ফেললেন, যা হয়তো আসলেই আপনি চান নি। কিন্তু বলে তো ফেলেছেন এবং অনেক সময়ই বলার পর ভুল বা অন্যায় হয়েছে তা জেনেও সেটা শোধরানোর ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের অহমবোধ। শয়তান এই সুযোগটাই গ্রহণ করে। ফলে পরিস্থিতি হয়ে ওঠে আরো জটিল, কষ্টদায়ক ও পীড়াদায়ক।

কথায় কথায় শপথ করা ছাড়াও অনেকের স্বভাব থাকে অভিশাপ দেয়া, বদদোয়া করা। নিজের জন্যে, পরিবারের জন্যে ও আপনজনদের জন্যে অভিশাপ যে কত ক্ষতিকর হতে পারে, অভিশাপ দেয়ার সময় মানুষ তা বুঝতে পারে না।

অনেক বছর আগের কথা। এক মা তার ছেলেকে নিয়ে এলেন। ছেলের বয়স ৩০। সে যা-কিছুই করতে যায় শেষ মুহূর্তে কাজটা পণ্ড হয়ে যায়। নিশ্চিত লাভজনক ব্যবসা, কিন্তু সে যখন সেই ব্যবসা শুরু করে, লাভের পরিবর্তে লোকসানের ঘানি তাকে টানতে হয়।

ব্যবসায় কয়েকবার সর্বস্বান্ত হয়ে সে চাকরি করার জন্যে বহু জায়গায় যোগাযোগ করেছে। বেশ কয়েক জায়গায়

ইন্টারভিউ দিল। ইন্টারভিউ ভালো হয়েছে। চাকরিটা তার হবে বলে নিয়োগকর্তা এক ধরনের নিশ্চয়তাও দিয়েছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেটা ফসকে গেল। চাকরি হলো না।

তরুণটিকে কারণ জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনার কী মনে হয়? কেন হচ্ছে না? মাকে দেখিয়ে বলল, আমার ওপর মায়ের অভিশাপ পড়েছে। ফলে সোনা ধরলেও সেটা ছাই হয়ে যায়। সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। মা হু হু করে কেঁদে ফেললেন। তিনি বললেন, ঘটনা মনে হচ্ছে তা-ই। কিন্তু আমি তো মন থেকে বলি নি। রাগের মাথায় বলে ফেলেছি যে, তুই কোনোদিন কিছু করতে পারবি না। ছেলের জন্যে সেটাই বাস্তবতা হয়ে দাঁড়াল।

যখন দেখা করতে এসেছিল, তার আগে ছ-বছর ধরে নানান কিছু চেষ্টা করে সে কিছুই করতে পারে নি। তার মনেও বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে, মায়ের অভিশাপ তার ওপর লেগে গেছে। তার দ্বারা কিছু হবে না। সে কিছু করতে পারবে না।

মা আবার হু হু করে কেঁদে উঠলেন।

আসলে প্রত্যেকদিনই এমন কিছু মুহূর্ত থাকে যখন ভালো মন্দ যাই-ই আপনি বলেন সেটা লেগে যায়, কবুল হয়ে যায়।

আমরা বিরক্ত হয়ে বা উত্তেজিত হয়ে বা আবেগপ্রবণ হয়ে নিজেকে, নিজের সন্তানকে, নিজের সম্পদকে, নিজের বাহনকে, নিজের গাড়িকে, নিজের উপকরণকে অভিশাপ দিয়ে ফেলি। সেটা দোয়া কবুলের মুহূর্তে পড়ে গেলে যদি তা কবুল হয়ে যায়, পরিণতিতে নিজের ভোগান্তিই বাড়ে।

এক মহিলা স্বামীর ওপর রাগ করে বলে ফেলেছিলেন, আল্লাহ যেন আমাকে ভালো কিছু না খাওয়ায়। সেই মহিলা

এরপর থেকে তার পছন্দনীয় সুস্বাদু কোনো খাবার মুখে তুলতে পারতেন না। বমি হয়ে যেত অথবা সেটা খেয়ে পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হতেন। যে সে পীড়া না, একদম ফুড পয়জনিং।

কখনো যদি তিনি কোনো খাবারের ফরমায়েশ নিজের ছেলেদেরকে দিতেন, ছেলেরা সেই খাবার তখন আর বাজারে পেত না। অনেক দোকান ঘুরেও সেই খাবার তারা জোগাড় করতে পারত না।

নবীজী (স) প্রত্যেক বিশ্বাসীকে একে অপরকে অভিশাপ দেয়ার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, আরেকজন বিশ্বাসীকে অভিশাপ দেয়া তাকে খুন করার সমান অপরাধ। আসলে শুধু আপনজন বা মানুষকে নয়, নবীজী (স) এমনকি পশুপাখি বা প্রাণীকেও অভিশাপ দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

ওমর (রা) একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। নবীজীর (স) সাথে ভ্রমণকালে এক মহিলা তার উটনীকে অভিশাপ দেয়। যখন নবীজীর (স) কানে কথাটা গেল, তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন যে, এর পিঠ থেকে বোঝা নামাও এবং এই উটনীকে মুক্ত করে দাও। কারণ এটি এখন অভিশপ্ত। অভিশপ্ত বাহনকে আর কাজে লাগানো যাবে না। উটনীর পিঠ থেকে বোঝা নামিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়া হলো আল্লাহর ওয়াস্তে।

অতএব নিজের পশু, নিজের বাড়ি, নিজের ঘর, নিজের যানবাহন—বিরক্ত হয়ে কোনোকিছুকেই অভিশাপ দেবেন না। কাউকে বদদোয়া করা থেকে, কাউকে অভিশাপ দেয়া থেকে সবসময় নিজেকে সংযত রাখবেন।

আর শপথের প্রসঙ্গে নবীজী (স) খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন, পারিবারিক কোনো বিষয়ে শপথ করে পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলা গুরুতর পাপ। এর চেয়ে নিয়মমতো কাফফারা দিয়ে শপথভঙ্গ করা উত্তম।

পারিবারিক শপথ যে অনেক সময় কত জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে, কত কষ্টদায়ক হতে পারে, যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে, এটা আমরা উম্মুল মোমেনিন আয়েশা (রা) এবং তার খুব প্রিয় ভাগ্নে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের মধ্যকার ঘটনা বিশ্লেষণ করলে আমাদের কাছে তা পরিষ্কার হবে।

আমরা জানি, উম্মুল মোমেনিন আয়েশা (রা) অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তিনি যা-কিছুই পেতেন, দাতব্য কাজে সেটা ব্যয় করতেন। তার প্রাপ্য হিসেবে খলিফার কাছ থেকে কিছু এলে সেদিনই গরিবের মাঝে পুরোটা বিতরণ করে দিতেন। নিজের জন্যে কিছুই রাখতেন না। অনেক সময় দাতব্য কাজের জন্যে তিনি নিজের সম্পদও বিক্রি করে দিতেন।

তার ভাগ্নে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা) হেজাজের গভর্নর থাকাকালে অনুভব করলেন যে, তার খালা অনেক অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করছেন। তিনি একদিন বলে ফেললেন যে, আসলে খালার এগুলো বন্ধ করা উচিত। তা না হলে আমি নিজেই তার ওপরে এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করব।

যখন মা আয়েশার (রা) কানে একথা গেল, তিনি সংবাদদাতাকে জিজ্ঞেস করলেন, আসলেই সে এই কথা বলেছে? সংবাদদাতা তাকে বললেন, জ্বী, একথাই বলেছেন। তখন আয়েশা (রা) ঘোষণা করলেন, আমি আল্লাহর নামে

শপথ করছি, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের সাথে আমি আর একটা কথাও বলব না।

যখন তিনি কথা বলা বন্ধ করে দিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা) তার পক্ষে সুপারিশ করার জন্যে কয়েকজন প্রবীণকে পাঠালেন। কিন্তু আয়েশা (রা) বললেন যে, আমি তার পক্ষে কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশ গ্রহণ করব না। শপথভঙ্গ করার মতো পাপ আমি করব না।

এই অবস্থা চলতে থাকল। আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা) যেহেতু তার খালাকে খুবই ভালবাসতেন, তিনি গভীর মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন।

একদিন তিনি আল মিসওয়ার ইবনে মাকরামা এবং আবদুর রহমান ইবনে আল আসওয়াদকে (রা) বললেন, আল্লাহর নামে আমি তোমাদের কাছে আবেদন করছি যে, তোমরা আমাকে খালার কাছে নিয়ে চলো। আমার সাথে সম্পর্ক ছেদ করার শপথ করা তার জন্যে বৈধ নয়।

তারা উম্মুল মোমেনিন আয়েশার (রা) বাসায় গেলেন। সালাম দিয়ে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। আয়েশা (রা) বললেন যে, ভেতরে আসো। তারা জিজ্ঞেস করলেন, আমরা সবাই? তিনি বললেন, হাঁ, তোমরা সবাই আসো। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, এদের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা) আছেন। তারা ভেতরে প্রবেশ করার পরে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা) পর্দাঘেরা এলাকায় প্রবেশ করে খালার সামনে হাজির হলেন এবং তাকে ক্ষমা করার অনুরোধ জানিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

আল মিসওয়ার এবং আবদুর রহমান (রা) দুজনই আয়েশার (রা) কাছে আবদুল্লাহকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে বার বার আবেদন জানাতে লাগলেন। অনেক আবেদনের পরে আয়েশা (রা) নিজেই কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন, আমি তো খুব কঠিন শপথ নিয়েছি।

কিন্তু তারা তাকে বোঝাতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত খালা আয়েশা (রা) ভাগ্নে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের (রা) সাথে কথা বললেন। শপথভঙ্গের কাফফারা হিসেবে ৪০ জন দাসকে তিনি মুক্ত করলেন। পরবর্তীকালে যখনই এই শপথের কথা মনে পড়ত তখনই আয়েশা (রা) কাঁদতে শুরু করতেন এবং এত কান্না যে তার চাদর ভিজে যেত।

আসলে যত কঠিন শপথই নেয়া হোক না কেন, আপনজনের সাথে সম্পর্ক ছেদের শপথ মানুষের কান্নাই বাড়ায়। আমরা এজন্যে সবসময় বলি, যে সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না, তার মাঝখানে কখনো দেয়াল তুলবেন না। দেয়াল উভয়পক্ষের কষ্টকে শুধু বাড়ায়। কোনো পক্ষের কষ্টই দেয়াল কখনো কমাতে পারে না।

প্রিয় সুহৃদ, আপনি যদি আল্লাহর নাম করেও কঠিন শপথ করে থাকেন, তার প্রতিকারও কিন্তু নবীজী (স) পরিষ্কারভাবে দিয়ে গেছেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে গ্রন্থিত এবং আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত।

নবীজী (স) বলেন, তুমি কোনো শপথ করার পর যদি সেটার কোনো ভালো বিকল্পের সন্ধান পাও, তবে ভালো বিকল্প গ্রহণ করবে। পরে শপথভঙ্গের কাফফারা আদায় করবে।

কাফফারা হচ্ছে একজন দাসমুক্তি বা ১০ জন গরিবকে দুইবেলা খাবার বা পোশাক দান করা। যদি এর কোনোটিই করার সামর্থ্য না থাকে, তবে তিন দিন রোজা রাখবে।

সম্পর্কের জন্যে ক্ষতিকর, সম্পদের জন্যে ক্ষতিকর, মানবতার জন্যে ক্ষতিকর, সমাজের জন্যে ক্ষতিকর কোনো শপথ আপনি করে থাকলে যখনই বুঝতে পারবেন যে, শপথটা ভুল হয়েছে, তখন ভালো বিকল্পটি গ্রহণ করবেন এবং শপথভঙ্গের জন্যে নির্ধারিত কাফফারা প্রদান করবেন।

এতে আপনার জীবন অনেক সুন্দর হবে, অনেক শান্তিময় হবে, অনেক সুখের হবে। অতএব কখনোই কল্যাণকর ভালো বিকল্প গ্রহণের পথে আপনার শপথকে বাধা হিসেবে দাঁড় করাবেন না।

নারী অধিকার

মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।

—*মোয়াবিয়া ইবনে জাহিমা (রা);* নাসাঈ

নিশ্চয়ই নারী পুরুষের সহোদর।

—*আয়েশা (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

ঈদুল ফিতরের দিন নবীজী (স) নামাজ আদায়ের পর খুতবা শেষ করে মহিলাদের কাতারের সামনে এলেন এবং তাদের কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন।

—*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* বোখারী, মুসলিম

তোমরা কখনো আল্লাহর দাসীদের (নারীদের) মসজিদে যেতে বাধা দিও না।

—*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

তোমরা আল্লাহর পরিচারিকার (অর্থাৎ স্ত্রীসহ নারী জাতির) সাথে দুর্ব্যবহার করবে না, গায়ে হাত তুলবে না। তোমাদের যাদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ এসেছে তারা ভালো মানুষ নও।

—*আয়াস ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

মগ্নপাঠ

নবীজী (স) বলেছেন, 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত'। এই হাদীসে নারীর সম্মানকে, মায়ের সম্মানকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আরেকটি হাদীসে তিনি খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, 'একজন পুরুষের ওপর সবচেয়ে বেশি অধিকার হচ্ছে তার মায়ের'। তিনি নারীকে পুরুষের অর্ধেক বলেন নি। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই নারী পুরুষের সহোদর। অর্থাৎ একই উদর থেকে নারী এবং পুরুষ এসেছে।

১৪০০ বছর আগে নবীজী (স) নারীর অধিকারের কথা শুধু বলেন নি, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন। পৃথিবীর বহু সমাজের নারীরা সেই অধিকার থেকে এখনো বঞ্চিত।

বিদায় হজের ভাষণে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন, হে মানুষ! নারীদের সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, তাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ কোরো না। তাদের কল্যাণের দিকে সবসময় খেয়াল রেখো।

তিনি নারীকে দিয়েছেন কর্মের অধিকার, ব্যবসাবাণিজ্য করার অধিকার এবং উপার্জনের অধিকার। নবীজী (স) পরিষ্কারভাবে বলেছেন, সম্মতি ছাড়া কোনো কুমারীকে, অনুমতি ছাড়া কোনো বিধবাকে বিয়ে দেয়া যাবে না। তিনি নারীর দেনমোহর ও ভরণপোষণ প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করেছেন। তিনি পরিবারে পুরুষের চেয়ে নারীর সেবা পাওয়ার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাবার আগে মায়ের এবং

ভাইয়ের আগে বোনের সেবা পাওয়ার প্রাধিকার বা অগ্রাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

নবীজী (স) নারীর প্রথম যে অধিকারটি নিশ্চিত করেছেন, সেটা হচ্ছে কুমারী নাম ব্যবহার করার অধিকার। বিয়ের পরেও নারী তার কুমারী নামেই পরিচিত হবে। তখনকার অধিকাংশ সমাজেই বিয়ের পর নারী তার কুমারী নাম হারিয়ে স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত হতো। এমনকি পাশ্চাত্যের নারীরাও এই কুমারী নাম বজায় রাখার অধিকার পেয়েছে মাত্র গত শতাব্দীতে, যা নবীজী (স) ১৪০০ বছর আগেই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

তবে নারীর সবচেয়ে বড় অধিকার তিনি নিশ্চিত করেছেন শিক্ষার ক্ষেত্রে। রসুলুল্লাহ (স) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্যেই জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। কারণ যে সমাজে, যে সভ্যতায় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নারী পিছিয়ে থেকেছে; সেই সমাজে, সেই সভ্যতায় নারী তার অধিকার থেকেও সবসময় বঞ্চিত হয়েছে। তিনিই প্রথম শুধু পুরুষের জন্যে নয়, নারীর জন্যেও শিক্ষাকে ফরজ করলেন।

এরপর জীবিকা ও স্বাধীন পেশা নির্বাচনের অধিকার। তখনকার মক্কায় ব্যবসার একটা বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করতেন নারীরা। যে যে পেশায় নারীদের যাওয়া সম্ভব ছিল, প্রত্যেক পেশাতেই তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করেছেন।

মদিনায় খাজরাজ গোত্রের রুফাইদা বিনতে সাদ (রা) চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসক পিতার সহকারী হিসেবে তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। অসুস্থদের শুশ্রূষার জন্যে তিনি মসজিদে

নববীর একেবারে সামনে তাঁবু স্থাপন করেন। বদর, খন্দক, ওহুদ, খয়বর ইত্যাদি যুদ্ধে আহতদের রুফাইদার (রা) ফিল্ড হাসপাতালে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন নবীজী (স) স্বয়ং। উম্মে আমারা, উম্মে আয়মান, উম্মে সুলাইম, উম্মে আতিয়া, রাবি বিনতে মাইওয়াজ, হিন্দ, আমিনা (রা) প্রমুখ নারী সাহাবীগণ রুফাইদার (রা) তত্ত্বাবধানে নার্স হিসেবে প্রশিক্ষণ নেন। খয়বরের যুদ্ধে রুফাইদার (রা) নেতৃত্বে নারী সাহাবীদের দল এত দক্ষতার সাথে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন যে, নবীজী (স) পুরুষ যোদ্ধাদের সমান যুদ্ধলব্ধ মালামাল রুফাইদাকে (রা) প্রদান করেন।

খলিফা ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) মদিনার বাজার কন্ট্রোলার হিসেবে নিয়োগ দেন আল শিফা বিনতে আবদুল্লাহকে (রা)। শরিয়া আইন অনুসারে লেনদেন হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে আল শিফা নিয়মিত বাজারে টহল দিতেন। ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল গভীর। যে কারণে বড় ব্যবসায়ীরাও চুক্তি করার আগে তার পরামর্শ নিত। পরবর্তীকালে আল শিফা বসরার প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

আল শিফার দক্ষতা ও সাফল্য দেখে মক্কাতেও খলিফা ওমর (রা) একজন নারী—সামরা নুহাইক আল আসাদিয়াকে বাজার কন্ট্রোলার হিসেবে নিয়োগ দেন। আমরা জানি যে, সুপ্রাচীনকাল থেকে মক্কা ছিল আরবের ব্যবসাকেন্দ্র। সেখানে যোগ্যতা এবং গুণ না থাকলে কোনো নারীর পক্ষে বাজার কন্ট্রোলারের দায়িত্ব পালন করা যে সম্ভব ছিল না, তা বলাবাহুল্য।

বোখারী ও তিরমিজী শরীফের হাদীসে রয়েছে, উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা) নৌ-যোদ্ধা হিসেবে সাগর পাড়ি দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে নবীজী (স) তার জন্যে দোয়া করেন। পরবর্তীতে খলিফা উসমানের (রা) সময় সাইপ্রাস অভিযানে প্রেরিত প্রথম নৌ-দলে উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা) অংশ নেন এবং সেখানেই তিনি শহিদ হন। সাইপ্রাসে এখনো তার মাজার রয়েছে।

অর্থাৎ তখনকার দিনে ব্যবসা পেশা সর্বত্র নারীরা স্বমহিমায় অংশ নিয়েছেন এবং পুরুষের পাশাপাশি তারা যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন।

ইসলামের আবির্ভাবের পর নারীরা প্রথমবারের মতো সম্পদের অধিকার লাভ করেন। স্ত্রীর নিজস্ব উপার্জন ও সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব করার কোনো সুযোগ স্বামীর ছিল না। যে কারণে সাহাবাদের পরের যুগেও বহু মহিলা তাদের সম্পদ জনহিতকর কাজে ওয়াকফ করেন। নারীদের ওয়াকফকৃত সম্পদ দিয়ে তখনকার দিনে বহু জ্ঞানকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিয়ের ব্যাপারে নারীর মতামত প্রকাশের অধিকারও নবীজী (স) প্রতিষ্ঠা করেন। একজন নারীর অনুমতি ছাড়া, সম্মতি ছাড়া বিয়েকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। স্বামীর সাথে যদি বনিবনা না হয়, তাহলে স্বামীকে তালাক দেয়ার অধিকারও তাকে প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে একটি বিখ্যাত ঘটনা—

বারীরা ও মুগীস নামের দুজন ক্রীতদাসের বিয়ে হয়। বারীরাকে আয়েশা (রা) মুক্ত করে দেন। ফলে বারীরা তখন স্বাধীন সত্তা কিন্তু তার স্বামী মুগীস তখনো ক্রীতদাস। বারীরা

সিদ্ধান্ত নিলেন দাসের সাথে তিনি ঘর করবেন না। কিন্তু মুগীস বারীরার জন্যে পাগল। ঘটনাটি নবীজী (স) পর্যন্ত গড়াল। তিনি বারীরাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তুমি পুনরায় মুগীসকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করো। বারীরা বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এটা কি আপনার নির্দেশ? নবীজী (স) বললেন, না, এটা আমার সুপারিশ। বারীরা বললেন, তাহলে আমার জীবনে মুগীসের কোনো প্রয়োজন নেই।

তবে নারীদের প্রতি নবীজীর (স) সবচেয়ে বড় অবদান হলো তাদের জন্যে জ্ঞানচর্চার দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া। জ্ঞানচর্চা এবং আধ্যাত্মিকতার যে-কোনো স্তরে উন্নীত হওয়ার দরজা নবীজী (স) নারীদের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন।

ইসলামের ইতিহাসে নারীরা সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছেন এই জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে। সাহাবীদের যুগ থেকেই নারীরা পুরুষ মুহাদ্দিসদের অধীন লেখাপড়া করেছেন। আবার বহু বিখ্যাত মুহাদ্দিসের ওস্তাদ ছিলেন নারী।

নবীজীর (স) ওফাতের পর তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবী আবু বকর, ওমর, আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ (রা)—এদের জীবদ্দশায়ই ফিকহ-সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন যেত উম্মুল মোমেনিন আয়েশার (রা) কাছে।

বিশিষ্ট সাহাবী আবু দারদার (রা) স্ত্রী তাবেঈ উম্মে দারদা (র) দামেস্ক ও জেরুজালেমের মসজিদে হাদীসের ক্লাস নিতেন। তার ক্লাসে পুরুষ মহিলা উভয়েই শিক্ষার্থী হিসেবে অংশ নেন। তার ছাত্রদের মধ্যে একজন আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান পরবর্তীতে খলিফা হন।

ইমাম মালিক ইবনে আনাসের (র) *মুয়াত্তা* ছিল সেকালের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থ। তার কন্যা ফাতিমা পুরো মুয়াত্তা মুখস্থ করেন এবং মুহাদ্দিসা হিসেবে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে পুরো খেলাফত জুড়ে।

ইমাম ইবনে জুহরি, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আবু ইয়ালা ও ইমাম মালিকের (র) মতো মুহাদ্দিস ও ফকিহদের শিক্ষকের তালিকায় নারী মুহাদ্দিসদের নাম পাওয়া যায়। ১৩ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ইমাম ইবনে তাঈমিয়ার একাধিক শিক্ষক ছিলেন নারী। সিরিয়ার মুহাদ্দিসা উম্মে আল খায়ের ফাতিমা বিনতে ইব্রাহিম মদিনায় রওজা মোবারকের দেয়ালের সামনে বসে হাদীসের ক্লাস নিতেন এবং কৃতী শিক্ষার্থীদের স্বহস্তে লেখা সনদ দিতেন।

হাজার বছর ধরে দামেস্কে জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল উমাইয়া মসজিদ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেখানে সহীহ বোখারী পাঠদানের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল আয়েশা বিনতে আব্দুল হাদীকে।

মামলুক ও আইয়ুবী শাসনামলে মিশর ও সিরিয়ায় হাদীস চর্চার বিশাল বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। আল মাদ্রাসা আল উমারিয়া, জামিয়া, হাম্বিলা, দারল হাদীস আন নূরিয়া, দারাল হাদীস আল কামালিয়া এই প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারী অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। নারী মুহাদ্দিসরা জ্ঞান অর্জনের জন্যে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে যেতেন। বিভিন্ন দেশে তারা শিক্ষাগ্রহণ করেছেন।

মরিয়ম বিনতে আল শায়খ, নূর আল দিন মিশর থেকে

মক্কায় ভ্রমণ করেন এবং একাধিক মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদীসের পাঠ নেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিসা শায়খ উম্মে আল কিরাম কারিমা বিনতে আহমেদ তুর্কমেনিস্তান, ইস্পাহান, জেরুজালেম ও মক্কা ভ্রমণ করেন।

সাহাবী, তাবেঈ ও তাদের পরবর্তী যুগের আলেমগণ কন্যাসন্তানের লেখাপড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বুজুর্গ সাদ আল খায়েরের কন্যা ছিলেন বিখ্যাত মুহাদ্দিসা শায়েখা উম্মে আব্দুল করিম ফাতিমা। তার জন্ম কাশগর। এখন যা চীনের সিনকিয়াংয়ে। উম্মে আব্দুল করিম কাশগর থেকে সমরখন্দ, বোখারা, মার্ভ, নিশাপুর হয়ে ইস্পাহান, বাগদাদ, দামেস্ক, জেরুজালেম নগরীর মশহুর মুহাদ্দিসদের কাছে হাদীসের পাঠ নেন। বিয়ের পর স্বামীর সাথে প্রথম দামেস্ক, তারপর কায়রোতে বসবাস করেন। বহু আলেম দামেস্ক ও কায়রোতে যেতেন কেবল শায়েখ ফাতিমার অধীনে লেখাপড়া করার নিয়তে।

ষোড়শ শতাব্দীতে হেজাজের শীর্ষ সাতজন মুহাদ্দিসের একজন ছিলেন নারী, নাম কোরাইশ আল তাবারিয়া। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস দিল্লীর ইসহাক আল দেহলভী। তার কন্যা আমাত আল গফুর বাবার কাছে হাদীসের পাঠ নেন। মুহাদ্দিসা আমাতের স্বামীও বিখ্যাত আলেম ছিলেন কিন্তু তিনিও হাদীস বা ফিকহ-সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় আটকে গেলে সমাধানের জন্যে স্ত্রীর শরণাপন্ন হতেন।

আসলে এত বড় ইমামদেরও নারীর কাছ থেকে সমস্যার সমাধান নিতে পরামর্শ নিতে কখনো কোনো জড়তা বা দ্বিধা

ছিল না। নারীরা তখন পরহেজগারি, তাকওয়া ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে কোন উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন তার একটি উদাহরণ দিয়ে এই আলোচনার উপসংহার টানব।

শাফেয়ী মাজহাবের প্রবক্তা শায়খুল ইসলাম ইমাম শাফি (৭৬৭-৮২০) মারা যান মিশরের তৎকালীন রাজধানী ফুসতাতে। ইমাম শাফি মৃত্যুর আগে অসিয়ত করে যান যে, জানাজা পড়ানোর পর তার লাশ যেন মুহাদ্দিসা সৈয়দা নাফিসা বিনতে হাসানের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শিতা ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্যে মিশরের মানুষ সৈয়দা নাফিসা বিনতে হাসানকে গভীর শ্রদ্ধা করত। ইমাম শাফি তার সরাসরি ছাত্র ছিলেন। মসজিদে সৈয়দা নাফিসার আলোচনায় তিনি অংশ নিতেন। অসিয়ত অনুসারে ইমাম শাফির লাশ তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সৈয়দা নাফিসা দোয়া করেন। কায়রোতে তার সম্মানে নির্মিত 'সৈয়দা নাফিসা মসজিদ' এখনো সগৌরবে বিদ্যমান।

ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো ধর্মবিশ্বাসের বিকাশ, প্রচার কিংবা সংরক্ষণে ধারাবাহিকভাবে নারীরা এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এমন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আমরা মুহাদ্দিসদের অবদান সম্পর্কে কমবেশি জানি। কিন্তু এই মুহাদ্দিসাদের অবদান সম্পর্কে আমরা খুব কম মানুষই জানি।

আসুন, কোরআন হাদীসের জ্ঞান বিতরণে জীবন উৎসর্গীকৃত সকল মুহাদ্দিসার প্রতি আমরা সালাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

এতিমের অধিকার

আল্লাহর শপথ! দুই দুর্বল সত্তা—এতিম ও নারীদের অধিকার রক্ষায় যে-কোনো ব্যর্থতাকে আমি পাপাচার বলে ঘোষণা করছি।

—*খুয়াইলিদ ইবনে আমর (রা);* নাসাঈ

আমি [নবীজী (স)] এবং একজন এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী, আমরা একসাথে জান্নাতে প্রবেশ করব। (তর্জনী ও মধ্যমা একসাথে তুলে দেখিয়ে বললেন, এই দুই আঙুলের মতো) জান্নাতে একসাথে থাকব।

—*সহল ইবনে সাদ (রা);* বোখারী, মুসলিম

মুসলমানদের সে ঘরটি উত্তম, যেখানে এতিমের সাথে ভালো ও সম্মানজনক ব্যবহার করা হয়। আর নিকৃষ্ট ঘর সেটাই, যেখানে এতিমের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়।

—*আবু হুরায়রা (রা);* ইবনে মাজাহ, মুসলিম, মুফরাদ

মগ্নপাঠ

নবীজী (স) আল্লাহর শপথ নিয়ে বলেছেন, দুই দুর্বল সত্তা—এতিম ও নারীদের অধিকার রক্ষার যে-কোনো ব্যর্থতাকে আমি পাপাচার বলে ঘোষণা করছি।

স্মরণাতীত কাল থেকে প্রতিটি সমাজেই এতিম এবং নারী বঞ্চিত এবং লাঞ্ছিত হয়েছে। আরবের জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত সমাজে এতিম ও নারীর লাঞ্ছনা নবীজী (স) প্রত্যক্ষ করেছেন। এতিমের সাথে দুর্ব্যবহার করা হতো সবচেয়ে বেশি। নারীর অবস্থান ছিল ক্রীতদাসের মতোই। আর শিশুকন্যাকে জীবন্ত কবর দেয়া তো গৌরবের বিষয় মনে করা হতো।

আমাদের এখনকার তথাকথিত প্রগতিশীল সমাজও কি এই অনাচার থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে? পরিবারগুলোতে এতিমের সাথে দুর্ব্যবহার করা, তাদের ধনসম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করা তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। প্রতি তিনজন নারীর একজনই শারীরিক বা মানসিকভাবে নির্যাতিত হন। আর ধর্ষিতার আর্তনাদ তো প্রতিদিনকার ঘটনা। আর ভ্রূণহত্যার মাধ্যমে পৃথিবীতে আসার আগেই কত কন্যাকে যে হত্যা করা হচ্ছে তার সঠিক পরিসংখ্যান কে দিতে পারবে!

প্রতিবেশী ভারতে কন্যা ভ্রূণহত্যা করোনা মহামারির চেয়েও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে! ২০২৩ সালে কলকাতার *আনন্দবাজার* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশেষজ্ঞরা অনুমান করছেন যে, এই ধারা চলতে থাকলে শুধু ভারত থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে জন্মের পূর্বেই মুছে যাবে ৬৮ লক্ষ কন্যাসন্তান!

সপ্তম শতাব্দীতে নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা বন্ধ করে নারীর অধিকার, নারীর সম্মান, নারীর মর্যাদা সুনিশ্চিত করার ডাক দিয়েছিলেন নবীজী (স)।

সেইসাথে এতিমের প্রতিও সম্মানজনক আচরণ নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বিশ্বাসীদের সেই ঘর উত্তম যেখানে এতিমের সাথে ভালো ও সম্মানজনক ব্যবহার করা হয়। আর নিকৃষ্ট ঘর সেটাই যেখানে এতিমের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়। তিনি খুব পরিষ্কার বলেছেন—এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী ও আমি জান্নাতে পাশাপাশি থাকব।

প্রিয় সুহৃদ! এতিমের দায়িত্ব গ্রহণ এবং নারীর সম্মান প্রতিষ্ঠা আমাদের সবারই সামাজিক দায়িত্ব। তাই আমরা যেন কোনোভাবেই ধর্ষকের পক্ষ অবলম্বন না করি। আমরা যেন ধর্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিই। এক্ষেত্রে যে-কোনো ব্যর্থতার বিষয়ে নবীজী (স) বলেন, ব্যক্তিবিশেষের পাপকাজ বন্ধ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো জাতি তা না করে, তবে সে জাতির ওপর আল্লাহ্ কঠিন বিপদ ও আজাব আপতিত করবেন।

এই আজাব-গজব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সমাজের সচেতন মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। ধর্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাশাপাশি কন্যা ভ্রূণহত্যা বন্ধেও কার্যকরী উদ্যোগ আমাদের নেয়া উচিত। আর এতিমের প্রতি সম্মানজনক আচরণ আমরা নিশ্চিত করতে চাই। সবসময় মনে রাখবেন, এতিমের মাথার ওপর যার হাত থাকে, আল্লাহর হাত তার মাথার ওপর থাকে।

শ্রমিক ও মজুরের অধিকার

কোনো শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করলে কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর তার মজুরি পুরোপুরি শোধ করো। অন্যথায় মহাবিচার দিবসে আল্লাহ কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা নেবেন।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর আগে তার মজুরি পরিশোধ করো।

—*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* ইবনে মাজাহ, মেশকাত

একজন অধীনস্থ কর্মী যখন (বৈধ কাজে) মালিকের আনুগত্য করে, তখন সে আল্লাহরই আনুগত্য করে এবং যখন সে (বৈধ কাজে) মালিকের অবাধ্যতা করে, তখন সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করে।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মুফরাদ (বোখারী)

মগ্নপাঠ

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা মেহনতি মানুষের ও শ্রমিক-মজুরের ওপর বেনিয়া মালিকদের শোষণ অবসানের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে হাদীসে।

মেহনতি মানুষ অর্থাৎ শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে যত বই লেখা হয়েছে তাতে বলা হয়, শ্রমিকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা আধুনিক ধারণা। ১৯ শতকে ন্যায্য মজুরির দাবিতে সংঘটিত শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ব্রিটেনে প্রথম শ্রম আইন প্রণীত হয়। আধুনিক শ্রম অধিকার নিয়ে এটি হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের দেয়া তথ্য।

অথচ আমরা যদি নবীজীর (স) জীবনের দিকে তাকাই, তিনি মানুষের মানবাধিকারকে যেভাবে সুনিশ্চিত করেছিলেন, একইভাবে শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কেও নির্দেশনা দিয়েছেন, শুধু তা-ই নয়, শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করার বাস্তব পদক্ষেপও তিনি নিয়েছিলেন।

মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তার যে মমতা, তার যে টান, সেই টানের কথা আমরা খুব পরিষ্কারভাবে জানতে পারি একটি ঘটনা থেকে। একবার এক বেদুইন এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসুলুল্লাহ! মসজিদে নববীতে যদি আপনাকে আমরা না পাই, তখন কোথায় আপনাকে খুঁজব? তিনি বলেছিলেন, মদিনার শ্রমজীবী মানুষের মাঝে আমাকে খুঁজবে। সেখানে আমাকে পাবে।

মেহনতি মানুষের পরিশ্রমকে তিনি কতটা সম্মান করতেন, আরেকটি ঘটনা থেকে আমরা সেটা বুঝতে পারি।

একদিন নবীজী (স) তার সাহাবীদের নিয়ে বসে ছিলেন। তখন একজন শ্রমিক তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। উপস্থিত সাহাবীরা মন্তব্য করলেন, হায়! এর মেহনত যদি আল্লাহর পথে হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো!

নবীজী (স) তাদের মন্তব্য সংশোধন করে দিয়ে বললেন, যদি তার এই মেহনত তার সন্তানদের লালনপালনের জন্যে হয়, তাহলে সে আল্লাহর পথেই কাজ করছে। তার মেহনত যদি তার পিতামাতার ভরণপোষণের জন্যে হয়, তাহলেও একথা প্রযোজ্য হবে। অন্যের কাছে ভিক্ষা করতে না হয়, সে উদ্দেশ্যে যদি সে মেহনত করে থাকে, তাহলেও সে আল্লাহর পথেই কাজ করছে।

আল্লাহর পথে কাজ বলতে আমরা তো নির্দিষ্ট কিছু ইবাদত-বন্দেগিকে বুঝি। কিন্তু স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে, ভিক্ষা থেকে বেঁচে থাকার জন্যে, পিতামাতার ভরণপোষণের জন্যে, সন্তানের লালনপালনের জন্যে যে মেহনত, সেটাও যে আল্লাহর পথে কাজের মতোই সম্মানিত কাজ, নবীজী (স) খুব স্পষ্টভাবেই সেটা বলেছেন। মেহনতি মানুষের প্রতি এর চেয়ে বড় সম্মান, এর চেয়ে বড় স্বীকৃতি আর কী হতে পারে!

আর শ্রমিকের মজুরি পরিশোধ করতে হবে তার ঘাম শুকানোর আগেই এবং দিতে হবে ন্যায্য পুরো মজুরি। মজুরি পুরোপুরি শোধ না করা হলে মহাবিচার দিবসে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দেবেন সেই সতর্কবাণীও তিনি করে গেছেন।

আবু যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবীজী (স) বলেন, তোমার অধীনস্থরা তোমার ভাই, তোমার খাদেম।

আল্লাহ তাদের ওপর তোমাকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন। তাই তাকে তা-ই খাওয়ানো উচিত, যা নিজে খাও এবং তা-ই পরানো উচিত, যা নিজে পরো।

নবীজী (স) নিজে তার অধীনস্থদের সাথে, তার খাদেমদের সাথে একসাথে বসে খাবার খেতেন এবং সাহাবীদেরও একসাথে বসে খাবার খেতে উৎসাহিত করতেন।

সাহাবী আল মারুর ইবনে সোয়াইদ (রা) বলেন, আমি দেখলাম আবু যর ও তার খাদেম (কর্মচারী) একইরকম আলখাল্লা পরে আছে। আবু যরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমার খাদেমকে, তোমার অধীনস্থকে তা-ই পরানো উচিত যা তুমি নিজে পরো।

আসলে মানুষের প্রতি নবীজীর (স) যে মমতা, মানুষের প্রতি যে ভালবাসা, বঞ্চিত অবহেলিত সর্বহারার প্রতি তার যে সমমর্মিতা তা শুধু কথায় নয়, তার জীবনাচারেও এর প্রতিফলন ঘটেছে। রসুল (স) তার অনুসারীদেরও একই জীবনাচার অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এবং অনেকেই এই আদর্শ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করেছেন।

প্রিয় সুহৃদ, এবার একটু নীরবে চিন্তা করুন—আপনার অধীনস্থ ও গৃহকর্মীর প্রতি আপনি কি সদয় আচরণ করেন? আপনি যা খান, তাকেও কি তা খেতে দেন?

অধীনস্থদের মজুরি কি সময়মতো পুরোপুরি শোধ করেন? নাকি দেরিতে দেন? মেহনতি মানুষ, রিকশাওয়ালা, শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, গৃহকর্মী, বাড়ির দারোয়ান, ড্রাইভার—

তাদের প্রতি আপনি কি সমমর্মী? আপনি কি তাদের আগে সালাম দেন? কিংবা তারা সালাম দিলে আপনি কি সুন্দরভাবে সেটার জবাব দেন? আপনি কি তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলেন?

আপনি কি গৃহকর্মীর সাথে, আপনার অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন? যদি দুর্ব্যবহার করেন তাহলে আপনার সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত। কেননা নবীজী (স) দুর্ব্যবহার কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

ইতোপূর্বে যদি এমন কোনো ভুল করে থাকেন, মনে মনে অনুশোচনা করুন। পরম প্রভুর কাছে ক্ষমা চান। তিনি দয়াময়, তিনি ক্ষমাশীল। অনুশোচনা করলে তিনি যে-কোনো ভুল ক্ষমা করে দেন।

আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করুন, অধীনস্থদের সাথেও এখন থেকে আপনি ভালো আচরণ করবেন এবং তাদের যথাযথ প্রাপ্য সময়মতো শোধ করবেন।

আপনি যাতে এই কাজগুলো করতে পারেন, অধীনস্থদের সাথে, গৃহকর্মীর সাথে যাতে সবসময় সুন্দর আচরণ করতে পারেন, নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, সেজন্যে করুণাময়ের করুণা প্রার্থনা করুন।

সদকায়ে জারিয়া : বহমান সৎকর্ম

একজন মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তার সকল সৎকর্মের সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি সৎকর্মের সওয়াব বা নেকি সে সবসময় পেতে থাকবে—১. সদকায়ে জারিয়া অর্থাৎ যে স্থায়ী দান থেকে মৃত্যুর পরও মানুষ উপকৃত হয়। যেমন : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। (তাই মৃত্যুর আগেই নিজের এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি সেবামূলক কাজে ওয়াকফ করুন।) ২. (কথন, লিখন প্রকাশ বা বিতরণের মাধ্যম) প্রচারিত জ্ঞান (কোরআনের জ্ঞান এবং এমন পুস্তক, যা সঠিক জীবনদৃষ্টি প্রদান করে মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে সাফল্যের সরলপথ দেখায়)। ৩. সুসন্তান (যে তার জন্যে দোয়া ও দান করে)।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম, আবু দাউদ

সাতটি কাজের নেকি একজন মানুষ তার মৃত্যুর পরও পেতে থাকবে। ১. জ্ঞানাগার (অর্থাৎ বই বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান), ২. খাল খনন, ৩. পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ৪. বৃক্ষরোপণ, ৫. মসজিদ নির্মাণ, ৬. কোরআনের কপি বিতরণ, ৭. নেক সন্তান, যে তার জন্যে দোয়া করবে।

—*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বাজ্জার

মগ্নপাঠ

নবীজী (স) সৃষ্টির জন্যে কল্যাণকর প্রতিটি কাজকে কত গুরুত্ব দিয়েছেন ও কত উৎসাহিত করেছেন তার একটি বাণী থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা হলো : খেজুরের এক-চতুর্থাংশ হলেও দান করো।

অর্থাৎ দান করতে হবে ও সৎ কাজ করতে হবে। এবং তা করতে হবে প্রতিদিন। তিনি বলেছেন একজন মানুষকে তার দেহের প্রতিটি অংশকে প্রতিদিন সম্পৃক্ত করতে হবে ভালো কাজে, সৎ কাজে, সেবামূলক কাজে, দানে। প্রতিটি ভালো ও কল্যাণকর কাজকেই তিনি দান হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এই দান শুধু অন্যের উপকারেই লাগে না, দাতার অশেষ কল্যাণ সাধন করে। দান পাপমোচন করে, অপমৃত্যু রোধ করে, দেহকে রোগমুক্ত করে, মনের বিষণ্নতা দূর করে, বালা-মুসিবত, বিপদ-আপদ তাড়িয়ে দেয়, সম্পদে প্রবৃদ্ধি বাড়ায়। সেইসাথে বাড়ায় আয়ু। দান সেবা সৎকর্ম একজন মানুষকে যতটা তৃপ্তি ও সুখ দিতে পারে, সেই সুখ সে কখনো নিজের জন্যে করা কাজ থেকে অর্জন করতে পারে না।

তবে দান থেকে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ পেতে হলে দানটি হতে হবে সৎদান। সূরা বাকারা-র ২৬১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘সৎদান এমন একটি শস্যবীজ, যাতে উৎপন্ন হয় সাতটি শিষ আর প্রতিটি শিষে থাকে শত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আরো বহুগুণ প্রবৃদ্ধি দান করেন’। অর্থাৎ ইহকালীন ও পরকালীন সুখ-সম্মান তখনই

আসবে যখন দাতা স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে দান করবেন। লোক-দেখানো বা আত্মপ্রচারের জন্যে নয়, পুরোটাই হবে স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে। এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত।

পরকালীন অনন্ত কল্যাণ লাভের জন্যে দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, দান করতে হবে সবচেয়ে পছন্দের জিনিস থেকে। সূরা আলে ইমরানের ৯২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমার প্রিয় ও পছন্দের জিনিস থেকে দান করতে না পারলে তুমি কখনো সত্যিকারের ধার্মিক হতে পারবে না। অন্যের জন্যে তুমি যা-কিছু ব্যয় বা দান করো আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন।' অর্থাৎ আল্লাহর কাছে সত্যিকারের ধার্মিক হিসেবে যিনি সম্মানিত হতে চান, তাকে অবশ্যই প্রিয় এবং পছন্দের জিনিস থেকে দান করতে হবে।

বিশিষ্ট সাহাবী আবু তালহা (রা) যখন কোরআনের এই আয়াত শুনলেন, তিনি কিছুক্ষণ ভাবলেন। তার অনেকগুলো খেজুর বাগান ছিল। একটি বাগানে ৬০০-র ওপরে খেজুর গাছ ছিল। এই বাগানটিই ছিল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং তার প্রিয়। আবু তালহা (রা) তার সবচেয়ে পছন্দের সম্পত্তি বিশাল খেজুর বাগানটি মদিনার দরিদ্রদের জন্যে দান করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি নবীজীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন যে, সবচেয়ে প্রিয় বাগানটি তিনি দান করতে চান যেন এই দানের মাধ্যমে পরকালে আল্লাহর কাছে তিনি সত্যিকারের ধার্মিকের মর্যাদা লাভ করেন।

নবীজীর (স) উপস্থিতিতে আবু তালহা (রা) এই দানের কথা ঘোষণা করে বাসার দিকে ফিরছেন। ফেরার পথেই পড়ল

তার প্রিয় খেজুর বাগান যেখানে তিনি মাঝে মাঝেই খেজুর গাছের ছায়ায় বসে সময় কাটাতেন। তিনি দেখলেন যে, সেখানে তার স্ত্রী ও সন্তানরা আনন্দে সময় কাটাচ্ছে। আবু তালহা (রা) তার স্ত্রীকে বললেন যে, মদিনার দরিদ্রদের জন্যে আমি এই খেজুর বাগান ওয়াকফ করে দিয়েছি।

তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এটা কেবল তোমার নামে ওয়াকফ করেছ নাকি আমাদের সবার নামে করেছ? আবু তালহা (রা) বললেন যে, আমাদের দুজনের নামেই ওয়াকফ করেছি। তার স্ত্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুক আবু তালহা! আমি কোরআনের এই আয়াত শোনার পর থেকে একই চিন্তা করছিলাম যে, মদিনার দরিদ্রদের কল্যাণে আমরা এটা ওয়াকফ করতে পারি কিন্তু তোমাকে বলার সাহস পাই নি। আল্লাহ আমাদের এই ওয়াকফ, এই দান কবুল করুন। চলো আমরা সবাই এখন বাগান ছেড়ে বাসায় যাই।

এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি দানের ক্ষেত্রে শুধু পুরুষ সাহাবীরা নন; নারী সাহাবীরাও কত অগ্রগামী ছিলেন।

শুধু আবু তালহা (রা) নন, সাহাবীদের বড় অংশ তাদের সম্পদ ওয়াকফ করেছিলেন তাদের জীবদ্দশাতেই। হযরত উসমানের (রা) সেই বীরে রুমা নামক কূপ ওয়াকফের বিখ্যাত ঘটনা তো আমরা জানি।

ইসলামের প্রথম যুগে কোরাইশদের নিপীড়ন যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, মক্কার মুসলমানরা মদিনায় হিজরত করে। হিজরতের পর মদিনায় মুসলমানদের সবচেয়ে বড় অভাব ছিল

পানির। তীব্র খরায় মুসলমানদের আবাসস্থলের কাছাকাছি যত কূপ ছিল একটি বাদে সবগুলো কূপ শুকিয়ে গেল।

সেই কূপের মালিক ছিল এক ইহুদি। সুযোগ পেয়ে সে তার কূপ থেকে পানি নিতে আসা মুসলমানদের কাছে অস্বাভাবিক রকমের চড়া দাম চাইত। ফলে পানির স্বল্পতার কারণে মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ল।

পরিস্থিতি দেখে নবীজী (স) সেই ইহুদিকে প্রস্তাব দিলেন, জান্নাতের একটি ঝর্নার সাথে এই কূপ তুমি বদল করতে রাজি আছ কিনা? ইহুদি রাজি হলো না। সে বলল, নগদ টাকার বিনিময়ে বেচতে রাজি আছি। এই ঘটনা উসমান ইবনে আফফানের (রা) কানে গেল। উসমান মক্কার অভিজাত ধনাঢ্য ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান। হিজরতের পর খুব দ্রুত তিনি নিজেকে মদিনাতেও একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নবীজীর (স) কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি মুসলমানদের জন্যে কূপটি কিনে নিই, জান্নাতে একটি ঝর্না আমি পাব কিনা। নবীজী বললেন, হাঁ।

উসমান (রা) তখন ইহুদির কাছে পুরো কূপ কেনার প্রস্তাব দিলেন। ইহুদি তখন পানি বেচে এত লাভ করছে যে উসমানের প্রস্তাব প্রথমে প্রত্যাখ্যান করল। উসমান (রা) তখন অর্ধেক কূপ কেনার পাল্টা প্রস্তাব দিলেন। ইহুদিরা তো হিসাবে খুব পাকা। সে হিসাবনিকাশ করে দেখল, কূপের অর্ধেক তো আমার থাকছেই। মোটা অংকে অর্ধেকটা বেচে দিলে ক্ষতি নাই। উসমান (রা) যে দাম ঠিক করবে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমিও দাম ঠিক করব। লাভ আসতেই থাকবে।

ইহুদি বিপুল মূল্যে কূপের অর্ধেক উসমানের কাছে বিক্রি করল। তবে সে শর্ত দিল, একদিন উসমান, একদিন সে; এইভাবে পালাক্রমে তারা কূপের পানি ব্যবহার করবে।

উসমান (রা) তার জন্যে বরাদ্দ দিনে মুসলমানদের জন্যে কূপের পানি ফ্রি করে দিলেন। যে যত খুশি পানি নিয়ে যাও। সবাই উসমানের (রা) দিনেই বেশি করে পানি নিয়ে যেত। ইহুদির দিনে কেউই কূপের ধারেকাছেও যেত না। ফলে ইহুদি পুরো কূপ বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলো। ২০ হাজার দিরহামে উসমান এই 'বীরে রুমা' কূপটি পুরোপুরি কিনে সবার ব্যবহারের জন্যে ওয়াকফ করে দিলেন। ওয়াকফ মানে হচ্ছে জনকল্যাণে দান।

ঘটনা কিন্তু এখানে শেষ না। বরং বলা যেতে পারে, শুরু। গত ১৪০০ বছর ধরে এই কূপটি পানিতে পূর্ণ থাকে। রসুলুল্লাহর (স) যুগে মদিনায় যত কূপ ছিল তার মধ্যে একমাত্র বীরে রুমা কূপটিই টিকে আছে। বর্তমানে এটি 'বীরে উসমান' নামে বিখ্যাত। এই ওয়াকফ থেকে প্রাপ্ত অর্থ এখনো দরিদ্রদের এবং হজযাত্রীদের প্রয়োজন পূরণে ব্যয় করা হয়।

অর্থাৎ হযরত উসমানের (রা) সেই দান বহমান দান হিসেবে এখনো চালু আছে। এ কারণেই বলা হয়, আল্লাহর সাথে ব্যবসা করলে ইহকাল ও পরকালে দুই জায়গাতেই আপনি লাভবান হবেন। যেভাবে উসমান ইবনে আফফান (রা) লাভবান হয়েছেন।

মৃত্যুর ১৪০০ বছর পরও তার নামে দান করা হচ্ছে। আবার পরকালে জান্নাতেও তিনি একটি ঝর্নার প্রতিশ্রুতি

রসুলুল্লাহর (স) কাছ থেকে পেয়েছেন। শুধু বীরে রুমা নয়। আরো বেশ কয়েকটি কূপ তিনি ওয়াকফ করেন।

এছাড়া হযরত ওমর, হযরত আলী, সাওদা বিনতে জামাহ, আয়েশা বিনতে আবু বকর, জুবায়ের ইবনে আওয়াম, মুয়াজ ইবনে জাবল, জায়েদ ইবনে সাবিত, আসমা বিনতে আবু বকর, উম্মে সালামা, উম্মে হাবিবা, সাফিয়া বিনতে হুয়াই, সাদ বিন আবি আক্কাস, খালিদ বিন ওয়ালিদ, আবু আরওয়া আল দাওয়াসি, হাফসা, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ, সাদ ইবনে উবাদা, উকবা ইবনে আমির, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী তাদের সম্পদের সবচেয়ে ভালো অংশ তাদের জীবদ্দশাতেই ওয়াকফ করে দেন। সাহাবীদের আমল থেকে ওয়াকফের যে সিলসিলা শুরু হয় তা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

ওসমানীয় খেলাফতের শেষদিকে তুরস্কের ৭৫ ভাগ আবাদযোগ্য ভূমিই ছিল ওয়াকফ সম্পত্তি। মিশরের ২০ শতাংশ, ইরানে ১৪ শতাংশ, আলজেরিয়াতে ৫০ শতাংশ, তিউনিসিয়ায় ৩৩ শতাংশ, গ্রিসে ৩৩ শতাংশ এবং ইংরেজরা বাংলা দখল করার আগে বাংলার ৩৩ শতাংশ কৃষিজমি ও স্থাবর সম্পত্তি ছিল ওয়াকফ সম্পত্তি।

বিস্ময়কর সত্য হচ্ছে, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ওসমানীয় খেলাফতের যুগে পুরো সাম্রাজ্যের রাজস্ব আয়ের এক-তৃতীয়াংশের সমান ছিল ২৬ হাজার ওয়াকফের আয়। একাদশ শতকের বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসা বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে এখনো বিদ্যমান কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ,

পাঠাগার, সরাইখানা, লঙ্গরখানা, হাসপাতাল, গণশৌচাগার, এতিমখানা, মুসাফিরখানা, পানি সরবরাহ এবং দরিদ্রদের খাদ্য সহায়তা, ঋণগ্রস্তদের ঋণমুক্তি, দুস্থ-বঞ্চিতদের দুই ঈদে বিশেষ উপহার দেয়া এবং মৃতের দাফন-কাফনের ব্যবস্থাসহ যতরকম সেবামূলক কাজ রয়েছে সবই প্রধানত এই ওয়াকফ সম্পত্তির আয় থেকে পরিচালনা করা হতো।

প্রত্যেকটি ওয়াকফ নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো। ফলে তারা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে কখনোই মাথা ঘামায় নি।

আমরা অধিকাংশই জানি না যে, ওয়াকফ সম্পত্তির দ্বারা সেবামূলক যে কাজগুলো করা হতো, তার মধ্যে একটি বড় কাজ ছিল একক মহিলাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, দরিদ্র অথবা অভিজাত একা মহিলারা এসব নারী নিবাসে থাকতেন। এই নারী নিবাস থেকেই মহিলাদের মানসিক সামাজিক আত্মিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করা হতো।

ওয়াকফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহিলারাও কোনো অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। ওসমানীয় খেলাফতের সময়কার দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে যে, খেলাফতের অধীন ২৬,৩০০ ওয়াকফের মধ্যে ১,৪০০-ই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহিলারা।

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রথম আঘাত হানে এই ওয়াকফভিত্তিক শিক্ষা সেবা স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক কাজের ওপর। আলজেরিয়াতে ফরাসিরা প্রথমেই সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ফেলে। বাংলায় ইংরেজরা ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ফেলে। তুরস্কে খেলাফতের

অবসানের সাথে সাথে ওয়াকফ সম্পত্তি সরকারিকরণ করা হয়। ফলে তুরস্কের বিশাল ওয়াকফগুলোর আয় কমতে শুরু করল। আস্তে আস্তে পুরো ওয়াকফ ব্যবস্থাই নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল।

প্রিয় সুহৃদ, আসলে সদকায়ে জারিয়ার জন্যে অর্থাৎ দানকে বহমান করার জন্যে দানকে প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হবে। অথবা দান দিয়ে প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করতে হবে। তাহলেই দান বহমান হবে। কারণ যতদিন ঐ প্রতিষ্ঠান থাকবে, কাজ থাকবে। মানুষ উপকৃত হবে এবং যিনি দাতা তিনি সদকায়ে জারিয়া থেকে অফুরন্ত নেকি পেতে থাকবেন।

এ প্রসঙ্গে বোখারী শরীফের হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসুল (স) একদিন জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যার কাছে নিজের ধনসম্পদের চেয়েও উত্তরাধিকারীর ধনসম্পদ প্রিয়? সাহাবীরা বললেন, আমাদের মধ্যে এমন (বোকা) কেউ নেই। উত্তরাধিকারীর চেয়ে নিজের সম্পদই আমাদের কাছে প্রিয়। তখন নবীজী (স) বললেন : তাহলে শুনে রাখো, (পরিমিত জীবনোপকরণ ব্যবহার করে) যা তুমি দান করলে, সৃষ্টির কল্যাণে ব্যবহার করলে, তা-ই তোমার সম্পদ। আর যা জমিয়ে রেখে গেলে তা তোমার উত্তরাধিকারীর সম্পদ।

আপনি যা জমিয়ে রেখে যাবেন তা আপনার সম্পদ নয়; বরং আপনার উত্তরাধিকারীর সম্পদ। আপনার উত্তরাধিকারীরা এই সম্পদ ভালো কাজে লাগালে অবশ্যই আপনার নেকি হবে। আর যদি মন্দ কাজে ব্যয় করে তাহলে সেটার দায়ভার কিন্তু থেকেই যাবে।

এজন্যে যাদের সন্তান রয়েছে, সন্তানকে দক্ষ চৌকস করার পাশাপাশি যদি সুসন্তান ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন, তাহলে সে আপনার জন্যে দোয়া এবং দান দুটোই করবে। আর যদি ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে না পারেন, তাহলে রেখে যাওয়া সম্পদ আপনার কোনো কাজে লাগবে না।

অতএব জীবিত অবস্থায় আপনি নিজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়তে পারেন অথবা প্রতিষ্ঠিত কোনো শিক্ষাবিষয়ক বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে আপনার সম্পত্তি ওয়াকফ অর্থাৎ দান করতে পারেন। কোরআন হাদীস এবং নৈতিকতার গুণে মানুষকে গুণান্বিত করে তোলে এমন বইপত্র বিতরণ করার মাধ্যমে আপনার দানকে সদকায়ে জারিয়ায় রূপান্তরিত করতে পারেন।

অর্থাৎ আপনার জীবদ্দশাতেই নিজের সম্পদের একটা ভালো অংশ ওয়াকফ করার মধ্য দিয়ে পরকালীন সঞ্চয়কে আপনি সমৃদ্ধ করতে পারেন। কেননা যতদিন জীবিত আছেন, আপনি ইচ্ছামতো দান করতে পারেন। কিন্তু আপনার সম্পত্তি যা-ই রেখে যাবেন, মৃত্যুর পরে তার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ আপনি দান করতে পারবেন অসিয়ত করার মধ্য দিয়ে।

আর সম্পদ থাকলে অসিয়ত করা যে কত গুরুত্বপূর্ণ সেটাও নবীজী বলে গেছেন। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে গ্রন্থিত এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, রসুলুল্লাহ (স) বলেন, 'অসিয়ত করার মতো কোনো সম্পদ থাকলে অসিয়ত না লিখে দু-রাতও কাটানো উচিত নয়'।

ইবনে মাজাহ এবং মেশকাতে গ্রন্থিত জাবির ইবনে আবদুল্লাহর (রা) বর্ণিত আরেকটি হাদীস। নবীজী (স) বলেছেন, 'যে অসিয়ত করার পর মারা গেল তার মৃত্যু হবে সৎকর্মশীল বিশ্বাসীর মৃত্যু। তার পাপ মোচন করা হবে'।

অর্থাৎ আপনার অসিয়ত করার মতো সম্পদ যদি থাকে তাহলে মৃত্যুর পরে আপনার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ সেবামূলক কাজে দিয়ে দেয়া হবে—এই অসিয়ত যত দ্রুত করবেন, তত আপনি কল্যাণের মধ্যে থাকবেন। কারণ আপনি জানেন না মৃত্যু কখন আসবে। যদি আপনি সেভাবে অসিয়ত লিখে না যান, তাহলে আপনার সম্পদ শুধু মুখের কথায় সেবামূলক কাজে ব্যয় না-ও হতে পারে।

প্রিয় সুহৃদ! সময় থাকতে সুস্থ থাকতে সম্পদের একটা ভালো অংশ পরকালীন কল্যাণের জন্যে বিনিয়োগ করুন। পরকালীন কল্যাণের জন্যে ওয়াকফ করুন।

আর মৃত্যুর পরে আপনার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ যাতে জনহিতকর কাজে, কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা হয় সেটা সুনির্দিষ্টভাবে অসিয়ত করুন। আপনার দান আপনার ওয়াকফ আপনার অসিয়ত—ইহকাল এবং পরকাল দুই কালেই আপনার কল্যাণ করবে।

রোগ নিরাময় ও রোগী দেখার আদব

আল্লাহ প্রতিটি রোগের নিরাময় পাঠিয়েছেন।

—আবু হুরায়রা (রা); বোখারী

রোগীদের দেখতে যাও এবং শবযাত্রায় অংশ নাও। তাহলে আখেরাতের কথা বেশি বেশি মনে পড়বে।

—আবু সাঈদ খুদরী (রা); বোখারী, ইবনে হিব্বান

যখন তুমি কোনো পীড়িতকে দেখতে যাও, তখন তাকে সান্ত্বনা দাও এবং বলো—'তুমি সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হবে।'

—আবু সাঈদ খুদরী (রা); মেশকাত

রোগীকে দেখতে গিয়ে সেখানে বেশিক্ষণ বসে থাকবে না। (কারো উপস্থিতি যদি রোগী বেশি পছন্দ করে তবে ভিন্ন কথা।)

—সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র); মেশকাত

যখন তোমরা কোনো রোগীর কাছে যাবে, তখন ভালো কথা, ইতিবাচক কথা বলবে (নেতিবাচক কথা বলবে না)। কারণ তোমরা তখন যা বলো, ফেরেশতারা তার সাথেই 'আমিন' বলেন।

—উম্মে সালামা (রা); মুসলিম, মেশকাত

মগ্নপাঠ

রোগ নিরাময় প্রসঙ্গে নবীজী (স) কিছু মৌলিক সত্য খুব সরল ভাষায় তুলে ধরেছেন—বিশ্বাস বা ঈমানের পর মানুষের জন্যে স্রষ্টার সবচেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা। তিনি আরো বলেছেন, তোমার ওপর তোমার শরীরের হক রয়েছে। অতএব শরীরের হক ঠিকভাবে আদায় করো।

আসলে আমাদের অধিকাংশেরই রোগগ্রস্ত হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে শরীরের হক ঠিকভাবে আদায় না করা। অর্থাৎ শরীরের যত্ন ঠিকভাবে না নেয়া। শরীরের যে যত্ন নিতে হবে, অধিকাংশ মানুষ সেটা অনুধাবনই করেন না। যখন শরীর আর যত্ন চায় না তখন তারা শরীরের যত্ন নেয়া শুরু করেন।

রোগগ্রস্ত হলে, অসুস্থ হলে একজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে নবীজী (স) বাস্তব সত্যের ওপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ প্রতিটি রোগের নিরাময় পাঠিয়েছেন।' অর্থাৎ এমন কোনো রোগ নেই, যে রোগ ভালো হবে না। গবেষকরা পর্যবেক্ষণে দেখেছেন যে, পৃথিবীতে যত জটিল রোগ আসুক, সেই রোগ থেকে কেউ না কেউ ভালো হয়েছে। অর্থাৎ যিনি সুস্থ হয়েছেন, তিনি যে-কোনোভাবে হোক নিরাময়ের সূত্র লাভ করেছেন।

আমরা কোয়ান্টামে বলি, নিরাময়ের সূত্র খুব পরিষ্কার। বিশ্বাস করতে হবে এক স্রষ্টার ওপর। স্রষ্টা যে-কোনো রোগ নিরাময় করতে পারেন। যেহেতু তিনি বলেছেন যে, এমন কোনো রোগ নেই যার নিরাময় স্রষ্টা পাঠান নি, অতএব

বিশ্বাসকে প্রবল করতে হবে এবং এর সাথে চারটি সূত্র প্রয়োগ করতে হবে—ধ্যান দোয়া দান ও দাওয়া।

৭৫ ভাগ রোগ যেহেতু মনোদৈহিক, এর জন্যে আসলে দাওয়া বা ওষুধের কোনো প্রয়োজন নেই। ধ্যান দোয়া এবং দান অর্থাৎ সাদাকা এই রোগগুলো থেকে নিরাময়ের জন্যে যথেষ্ট। বাকি ২৫ ভাগ রোগ ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসজনিত কিংবা ওষুধ সার্জারির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াজনিত। এই ২৫ ভাগ রোগের জন্যে ধ্যান দোয়া দানের পাশাপাশি ওষুধ প্রয়োজন।

আমরা সবসময়ই বলি, কোন ডাক্তারের কাছে যাবেন? যে ডাক্তার আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং কম ওষুধ লেখেন। আর শরীরের হক যদি ঠিকভাবে আদায় করেন, আপনার অসুস্থতার পরিমাণ এমনিতেই অনেক কমে যাবে।

কোয়ান্টামে আমরা যত্নায়নের পাঁচটি সূত্র কাজে লাগাই।

১. দম। নিয়মিত দমের চর্চা করা, প্রাণায়াম বা ব্রিদিং এক্সারসাইজ করা।

২. আহার। স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিমিত খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৩. ব্যায়াম। শরীরটাকে সবসময় কাজের মধ্যে রাখা।

৪. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

৫. ছন্দায়ন।

ব্যায়ামের ক্ষেত্রে একটা সুন্নতের চর্চা যদি আমরা করি, তাহলে আমাদের প্রত্যেকের ফিজিক্যাল ফিটনেস অনেক বেড়ে যাবে, যা রসুলুল্লাহ (স) প্রায়শই করতেন। সেটা হচ্ছে কারফাসা ভঙ্গিতে বসা।

কারফাসা ভঙ্গির বাংলা নাম হচ্ছে বঙ্গাসন। এটি এক চমৎকার উপকারী আসন যেখানে বসে থাকাটাই ব্যায়াম। শুধু বসে থাকার মধ্য দিয়ে পা হাঁটু গোড়ালি ঊরু কোমর নিতম্ব এবং তলপেটের যত অঙ্গ—প্রত্যেকটা অঙ্গের চমৎকার ব্যায়াম হয়, চমৎকার উপকার হয়।

এর সাথে আরেকটি অত্যন্ত পুণ্যের কাজ হলো রোগীকে দেখতে যাওয়া। ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রধান হিসেবে শত ব্যস্ততার মধ্যেও নবীজী (স) সময় বের করে রোগগ্রস্ত মানুষকে দেখতে যেতেন। হাদীস এসেছে, একজন বিশ্বাসীর ওপর আরেকজন বিশ্বাসীর যে পাঁচটি অধিকার রয়েছে, তার একটি হলো সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া।

রোগী বা অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়ার সামাজিক ও আত্মিক গুরুত্ব এবং ইহকালীন ও পরকালীন গুরুত্ব সুস্পষ্ট হবে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে। এতে বলা হয়েছে, 'মহাবিচার দিবসে মহামহিম আল্লাহ অনুযোগ করবেন—হে আদমসন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে যাও নি। অভিযুক্ত তখন আরজ করবে, প্রভু হে! তুমি তো মহাবিশ্বের প্রতিপালক। তুমি কীভাবে অসুস্থ হতে পারো? আমি কোথায় তোমাকে দেখতে যাব? আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে অমুক অসুস্থ ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাও নি। তুমি কি জানতে না যে, তাকে দেখতে গেলে সেখানেই আমাকে পেতে?' (মুসলিম)

এই হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি, একজন অসুস্থ মানুষ বা রোগী সরাসরি আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকে। আপনি যখন

তাকে দেখতে যান, তখন শুধু সামাজিক মানবিক দায়িত্ব আপনি পালন করছেন না। আপনি আসলে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করছেন। এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি অন্যান্য হাদীসেও আমরা দেখতে পাই।

আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে, 'কেউ যখন কোনো অসুস্থ মানুষকে দেখতে যায়, তখন সে আল্লাহর রহমতের ছায়ায় প্রবেশ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে রোগীর সাথে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে রহমত দ্বারা পুরস্কৃত হতে থাকে'। (ইবনে মাজাহ)

নবীজী (স) যে শুধু অসুস্থ অনুসারীদের দেখতে যেতেন তা নয়। মদিনায় বসবাসরত ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা অসুস্থ হলে তাদের বাড়িতেও যেতেন। আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন, এক ইহুদি বালক নবীজীর সেবা করত। সে অসুস্থ হলে নবীজী (স) তার বাড়িতে তাকে দেখতে যান।

তবে যখন রোগীকে দেখতে যাবেন, তখন কয়েকটি শুদ্ধাচার মেনে চলা উচিত। এক, সময় দেখে যাওয়া উচিত। পারতপক্ষে খুব ভোরবেলা, খাবারের সময়ে কিংবা গভীর রাতে রোগীর বাড়িতে উপস্থিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কখন গেলে সুবিধা হয় এই সময়টা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আগে জেনে নেয়া সবচেয়ে ভালো।

দুই, রোগীর বাড়ি বা হাসপাতাল, যেখানেই যান না কেন, বেশিক্ষণ বসবেন না। অবশ্য রোগী যদি আপনার উপস্থিতি বিশেষভাবে কামনা করে তাহলে আলাদা বিষয়। তা না হলে সাক্ষাতের সময়টা সংক্ষেপ করুন। সালাম, শুভেচ্ছা বিনিময়

করুন। এখন কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করতে পারেন। তার জন্যে দোয়া করুন এবং হাসিমুখে বিদায় নিন।

আসলে অনাকাঙ্ক্ষিত সময়ে রোগীকে দেখতে যাওয়া এবং দীর্ঘসময় সেখানে অবস্থান করার মতো বোকামি করবেন না। রোগীর মনে বিরক্তির সঞ্চার করলে তা তার অসুস্থতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়ার শামিল হবে।

তিন, রোগীর সাথে কী কথা বলবেন এটাও গুরুত্বপূর্ণ। তার পাশে বসুন। কেমন অনুভব করছে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করুন। ভালো ও ইতিবাচক কথা বলুন। কোনো নেতিবাচক কথা বলবেন না। তাকে সাহস দিন। তাকে বলুন, ইনশাআল্লাহ আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন, দীর্ঘজীবী হবেন এবং এই রোগের মধ্য দিয়ে আল্লাহ আপনাকে গুনাহমুক্ত করবেন।

কখনো রোগের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চেয়ে রোগীকে পেরেশান করবেন না। সবচেয়ে ক্ষতিকর জিনিস হচ্ছে এর আগে এই রোগে কারা আক্রান্ত হয়েছে বা কত কষ্ট পেয়ে মারা গেছে এই জাতীয় ফালতু আলাপ করে রোগী ও তার পরিবারকে দুশ্চিন্তায় ফেলা। অর্থাৎ রোগীর সামনে বা রোগীর পরিবারের সাথে নেতিবাচক কোনো কথা বলবেন না। বরং রোগীর সাথে সম্পর্ক অনুসারে সুযোগ থাকলে ডান হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করুন। তার জন্যে দোয়া করুন :

‘হে আল্লাহ! হে মানুষের প্রতিপালক! তুমি তার কষ্ট দূর করে দাও, তুমি তাকে নিরাময় করো। তুমিই নিরাময়কারী, তোমার নিরাময় ছাড়া আর কোনো নিরাময় নেই। তুমি তাকে পূর্ণ নিরাময় প্রদান করো’।

নবীজী (স) রোগীর জন্যে এভাবেই দোয়া করতেন। সাহাবীরাও অসুস্থদের নিরাময়ে এই দোয়া করতেন।

চার, অসুস্থ ব্যক্তির কোনো ইচ্ছা আছে কিনা সেটা জেনে নিন। সে যদি কোনোকিছু ইচ্ছা করে, তাহলে সেটা পূরণ করতে সচেষ্ট হোন এবং বিদায়ের আগে অসুস্থ ব্যক্তির কাছে দোয়া চান। নবীজী (স) বলেন, তুমি যখন কোনো রোগীকে দেখতে যাও, তখন তার কাছে তোমার জন্যে দোয়া চাও। কারণ তার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মতোই।

অতএব যখন রোগীকে দেখতে যাবেন, সবসময়ই তার জন্যে দোয়া করবেন এবং তার কাছ থেকে দোয়া চেয়ে তারপর বিদায় নেবেন। এতে রোগীর কল্যাণের পাশাপাশি আপনিও কল্যাণের ছায়াতলে, রহমতের ছায়াতলে থাকবেন।

মৃত্যু : নতুন আনন্দলোক

বিশ্বাসীর জন্যে মৃত্যু হচ্ছে আল্লাহর উপহার।

—*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* বায়হাকি (মেশকাত)

একজন বিশ্বাসী হিসেবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম পুরস্কারের প্রত্যাশা নিয়ে।

—*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মুসলিম

একজন মানুষ মারা গেলে ফেরেশতারা খোঁজ নেয়—সে অগ্রিম কী পাঠিয়েছে। কিন্তু আত্মীয়স্বজনেরা খোঁজ নেয়—সে কী রেখে গেছে।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মেশকাত, বায়হাকি

মগ্নপাঠ

জন্মগ্রহণ করার পর একটি মাত্র সত্য যদি থাকে সেটা হচ্ছে মৃত্যু—এই পৃথিবী থেকে একদিন বিদায় নিতে হবে। পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে'।

জন্মগ্রহণ করার পর মৃত্যু থেকে পালানোর কোনো উপায় কারো নেই। মৃত্যুর মুখোমুখি সবাইকে হতে হবে। তবে একেকজনের মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একজন ভোগীর মৃত্যু এবং একজন যোগীর মৃত্যু, একজন বিশ্বাসীর মৃত্যু ও একজন মুনাফেকের মৃত্যু, একজন বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু, একজন সত্য অস্বীকারকারীর মৃত্যু কখনো এক হতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা সূরা জাসিয়ার ২১ নম্বর আয়াতে খুব সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'দুরাচারীরা কি মনে করে যে, তাদের জীবন ও মৃত্যু এবং বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের জীবন ও মৃত্যু একইরকম হবে? কত ভ্রান্ত ধারণা ওদের!'

একজন বিশ্বাসী সৎকর্মশীল জীবনকে যেভাবে আলিঙ্গন করে, একইভাবে সে মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করে। আর একজন দুরাচারী মৃত্যু থেকে সবসময় পালাতে চায়। সে মনে করে—তার এই পার্থিব জীবন যে মুহূর্তে শেষ, সমস্ত সম্ভাবনাও তখন শেষ। মৃত্যুকে সে মনে করে জীবনের সবকিছুর সমাপ্তি।

আর একজন বিশ্বাসীর কাছে মৃত্যু এক নতুন জীবনের সূচনা। তাই একজন দুরাচারী, একজন ভোগী, একজন বস্তুবাদী সবসময় একধরনের অস্থিরতা অশান্তি এবং

অনিশ্চয়তায় ভোগে—কখন তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়!

মৃত্যু জীবনের অনিবার্য পরিণতি হলেও এরা কখনোই মৃত্যুকে স্বাগত জানাতে পারে না। মৃত্যুকে আনন্দিত চিত্তে আলিঙ্গন করতে পারে না। একজন ভোগবাদী দুরাচারীর জন্যে মৃত্যু এক মূর্তমান আতঙ্ক। মৃত্যুভয়ে সে সবসময় ভীত আতঙ্কিত থাকে। আর একজন বিশ্বাসীর জন্যে মৃত্যুকে নবীজী (স) বলেছেন আল্লাহর উপহার। তিনি বলেছেন, মৃত্যু আসলে একটা সেতু; যা অতিক্রম করে সে তার পরম প্রভুর সাথে মিলিত হতে পারবে।

সকল বিশ্বাসীর কাছেই জন্ম যেমন আনন্দ নিয়ে আসে, একইভাবে মৃত্যুও তাকে আরেক আনন্দলোকে নিয়ে যায়। যে কারণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনায়াসে বলতে পেরেছেন, 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান।' তিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। তার গীতাঞ্জলি আসলে স্রষ্টাবন্দনার বাণী। গীতাঞ্জলিতে যে সাবলীলতায় স্রষ্টাবন্দনা করা হয়েছে, বাউলদের গানে সেই একই বন্দনাগীতি। কবি নজরুলের হামদ-নাতেও একই স্বতঃস্ফূর্ততা।

সব্যসাচী লেখক কবি সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায় মৃত্যুর দ্যোতনা একইরকম। সৈয়দ হক মৃত্যুর দু-মাস আগে লেখেন 'মৃত্তিকার ঘন অন্ধকারে' কবিতাটি :

> মৃত্যুপুরে মৃত্তিকায় এই দেহ প্রথিত ফসল,
> অন্তিম প্রার্থনা শেষে ফিরে যায় সকল স্বজন
> চল্লিশ কদম দূরে
> পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তখন—

বলা হয় ফেরেশতা কবরে নামে সংখ্যায় দুজন—
সম্ভবত সেই তারা যারা ছিল কাঁধের ওপরে
যখন জীবিত ছিল এই লোক, কাঁধের ওপরে
যারা প্রতি মুহূর্তের পাপপুণ্য যা কিছু সে করে
সব লিখে রাখে তার বিবরণ বিশ্বস্ত অক্ষরে।
এখন এই কবরের মৃত্তিকার ঘন অন্ধকারে
স্বর্গীয় আলোটি ফোটে
সেই আলোয় পড়া যেতে পারে
তাদের প্রতিটি পাতা—জীবিতরা এখন ওধারে
যেতে যেতে গল্প করে—
লোকটি কি বেঁচে যেতে পারে
এইবার শেষবার—বস্তুত সে ছিল পাপী-তাপী?
আমি তো দুর্বৃত্ত হেন, এইসব নেই ভাবাভাবি

আসলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, জাতীয় কবি নজরুল, সৈয়দ হক—এদের সাহিত্য সাধনায় ও কাব্যচর্চায় হাফিজ খৈয়াম রুমি জামি সাদী-র প্রভাব তারা নিজেরাই স্পষ্ট করে বলেছেন। হাফিজের সমাধির পাশে বসে কবিগুরু বিবরণী লিখেছিলেন, 'নিশ্চিত মনে হল, আজ কত-শত বৎসর পরে জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা লোক'।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল হাফিজ ও খৈয়াম অনুবাদ করেছেন। একইভাবে মৃত্যুর দু-মাস আগে লেখা সৈয়দ হকের কবিতা বলে দেয় তার ধমনীতে প্রবাহিত সুফি রক্তের কথা। হাফিজ খৈয়াম রুমি—এরা ছিলেন কবি, জ্ঞানী ও বিশ্বাসী।

ওমর খৈয়াম সম্পর্কে অনেকের মনেই অনেক রকম ধারণা আছে। কিন্তু তার জীবন একজন বিশ্বাসীর জীবন। আর ওমর খৈয়াম কবি ছিলেন, সুফি ছিলেন, গণিতজ্ঞ ছিলেন, জ্যোতির্বিদ, জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি তারিখ-ই-জালালি নামে নির্ভুল ক্যালেন্ডার তৈরি করেন। বর্তমান প্রচলিত গ্রেগ্ররি ক্যালেন্ডারের সাথে তুলনা করলেই খৈয়ামের গণনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। গ্রেগরি ক্যালেন্ডার অনুসারে ৩,৩৩০ বছরের গণনায় একদিনের পার্থক্য দেখা দেবে। অপরদিকে ওমর খৈয়ামের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী গণনা করলে ৫,০০০ বছরে একদিনের তারতম্য দেখা দেবে। খৈয়ামের অন্তর্দৃষ্টি এত প্রখর ছিল যে, নিজের মৃত্যুর দিনক্ষণ সম্পর্কেও তার ধারণা ছিল।

ঐতিহাসিক শাহ জুরি লিখেছেন যে, মৃত্যুর দিন ওমর খৈয়াম রোজা রেখেছিলেন। মাগরিবের সময় হলে তিনি নামাজে দাঁড়ান। সেজদায় গিয়ে তিনি উচ্চস্বরে বলেন, ‘আল্লাহ! যথাসাধ্য তোমাকেই চেয়েছি। আজ আমার মিনতি—তোমার করুণা ও ক্ষমা থেকে যেন বঞ্চিত না হই।’ সেজদা থেকে তিনি আর ওঠেন নি।

আসলে একজন বিশ্বাসীর মৃত্যু এমনই হয়। কর্মময় মৃত্যু। একজন বিশ্বাসী জীবনকে যেমন ইতিবাচকভাবে বরণ করেন, আলিঙ্গন করেন, একই ইতিবাচকতায় তিনি আলিঙ্গন করেন মৃত্যুকেও। ইমাম গাজ্জালীর মৃত্যুর দিকে যদি তাকাই—

মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন আগে তিনি জীবনের শেষ পুস্তিকা *ইলজাম আল-আওয়াম* রচনা করেন। তার ভাই আহমদ গাজ্জালী ও পরবর্তীতে ঐতিহাসিক ইবনে জাওযি তার মৃত্যুর

ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন :

> দিনটি ছিল সোমবার। ফজরের সময় বিছানা ত্যাগ করে ওজু করে তিনি নামাজ পড়লেন। তারপর এক ভক্তকে বললেন কাফনের কাপড় নিয়ে আসো। কাফনের কাপড় আনা হলো। কাপড়টা চোখ বরাবর তুলে ধরে বললেন, 'আল্লাহ! তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এই সময়ের জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম'। তারপর কাফনের কাপড় বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং চলে গেলেন।

আসলে একজন মানুষের মৃত্যু বলে দেয় তিনি কতটা তৃপ্ত ছিলেন, তিনি কতটা সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কারণ সত্য উপলব্ধি না করলে একজন মানুষ মৃত্যুর সময় এটা বলতে পারেন না যে, আল্লাহ! এই সময়ের জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম। তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বাংলায় মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া। জীবনের শেষ মুহূর্ত তিনি কাটিয়েছেন লেখার টেবিলে। রাতের বেলা তিনি লিখতে বসেছিলেন, পরদিন ভোরে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। টেবিলের ওপর পেপারওয়েট দিয়ে চেপে রাখা ছিল একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ—'নারীর অধিকার'।

আসলে একজন বিশ্বাসী সবসময় কর্মময় মৃত্যুকে পছন্দ করেন। ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং সফল রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম অবসর জীবন বেছে নিতে পারতেন কিন্তু রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বেরিয়ে তিনি তরুণদের অনুপ্রাণিত করার মিশন নিলেন। জীবনের শেষ দিনগুলো তিনি শিক্ষার্থীদের

সামনে আশার বাণী এবং বড় স্বপ্ন দেখার কথা যতভাবে পেরেছেন তুলে ধরেছেন। ৮৩ বছর বয়সে শিলংয়ে মঞ্চে তরুণদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতে করতেই তিনি পড়ে গেলেন। ব্যস! অনন্ত আনন্দলোকে চলে গেলেন।

প্রিয় সুহৃদ! জীবনের মতো কখন আপনি মৃত্যুকেও একইভাবে আলিঙ্গন করতে পারবেন? মৃত্যুকে যত বেশি বেশি স্মরণ করবেন, তত মৃত্যু আপনার কাছে আপন হবে। এজন্যেই নবীজী (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে বুদ্ধিমান সে-ই যে মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করে এবং মৃত্যুকে বরণ করার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে। সে দুনিয়ায় সম্মানিত হয় আর আখেরাতেও পাবে উষ্ণ অভ্যর্থনা।

মৃত্যু ও পরকালের কথা স্মরণ রাখার সহজ উপায় হচ্ছে যারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন তাদের কবর জিয়ারত করা। যখন কবরে শায়িত ব্যক্তির জন্যে আপনি দোয়া করবেন, পার্থিব ভোগবিলাস জৌলুস যে কত ঠুনকো ও অসার সেটা প্রতিবার নতুন করে উপলব্ধি করবেন।

কর্মময় প্রশান্ত মৃত্যু পেতে চাইলে কী করতে হবে তা-ও নবীজী (স) খুব পরিষ্কার বলে গেছেন যে, 'তিনটি গুণের অধিকারী হলে একজন মানুষ প্রশান্ত মৃত্যুতে ধন্য হবে—

১. দুর্বলের প্রতি সমমর্মী হলে, ২. পিতামাতার প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধা থাকলে, ৩. অধীনস্থের প্রতি যত্নবান হলে।

আসলে এই গুণগুলো শুধু বিশ্বাসী এবং সৎকর্মশীল মানুষই অর্জন করতে পারেন। যে বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল, মৃত্যু তাকে কখনো আতঙ্কিত করে না। মৃত্যু তার জন্যে বন্ধুর সাথে

মিলনের সেতু। জালালুদ্দিন রুমি তার বিখ্যাত কবিতা 'যেদিন আমি মারা যাব' এই কবিতায় সেকথাই বলেছেন :

যখন আমার মরদেহ কবরে নিয়ে যাওয়া হবে,
কেঁদো না
বোলো না সে চলে গেছে, সে চলে গেছে
মৃত্যু চলে যাওয়ার নাম নয়
সূর্য ডুবে যায়, চাঁদও ডুবে যায়
কিন্তু তারা হারিয়ে যায় না।
মৃত্যু, সে তো মহামিলনের পথ
কবর মনে হয় কারাগারের মতো
আসলে এটা হচ্ছে এক মিলনমেলা।
মৃত্যু, সে তো একটা পর্দা
যার আড়ালে লুকিয়ে আছে স্বর্গে সমবেত পুণ্যাত্মারা।
তোমার কণ্ঠ এখানে স্তব্ধ হয়ে গেছে
কিন্তু আনন্দের উল্লাসধ্বনি শোনা যাবে
পর্দার ওপারে গেলেই।

রুমি অসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তার শেষযাত্রা যেন শোকযাত্রা না হয় এবং তার শেষযাত্রা শোকযাত্রা ছিলও না। মুসলমান খ্রিষ্টান ইহুদি সব ধর্মের মানুষেরা বরযাত্রার মতো তাকে সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে কবরে শুইয়ে আসেন। তাকে রেখে আসেন সেই পর্দার ওপারে। যেখানে গিয়েই তিনি শুনবেন আনন্দের উল্লাসধ্বনি। বিশ্বাসী সৎকর্মশীল মানুষ এভাবেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। আমরাও মৃত্যুকে এভাবেই আলিঙ্গন করতে চাই। পরম করুণাময় আমাদের সহায় হোন।

প্রিয় পাঠক,

‘হাদীস পাঠ’ সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে পারেন :

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক
যোগ ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।
E-mail : info@quantummethod.org.bd

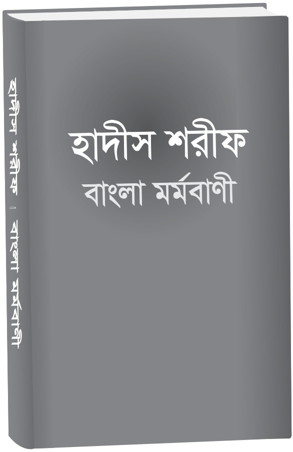

নবীজীর (স) কিছু বাণীর সহজ বাংলা মর্মান্তর।

জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো
স্থান পেয়েছে বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ে।

পড়া শুরু করুন যে-কোনো পাতা থেকে।
ডুবে যান বাক্যের গভীরে।
আপনি পাবেন পথের দিশা। জীবন বাঁক বদলাবে।
আপনার উত্তরণ ঘটবে উচ্চতর মানবে।

শুদ্ধাচারী আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্যে
এ বইটি হতে পারে অন্যতম সহায়ক পাঠ্য।

মধ্যযুগে প্রাচ্যে সৃষ্টি হয়েছিল এক আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা। এর ভিত্তি ছিল কোরআনের ফলিত রূপ নবীজীর (স) জীবন ও হাদীসের জ্ঞান। হাদীস পাঠ তখন শুধু নৈতিক শিক্ষায় সীমাবদ্ধ ছিল না, ছিল রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার অবিচ্ছেদ্য উপকরণ।

বিশ শতক থেকে হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞানের তৃষ্ণা পাশ্চাত্য প্রাচ্য সবখানেই ক্রমাগত বাড়ছে। হাদীসের সত্যজ্ঞান আমরা যত নিজে আত্মস্থ করব এবং চারপাশে ছড়িয়ে দেবো, নৈতিক মানবিক মহাসমাজ নির্মাণের দিকে তত এগিয়ে যাব।

The SCIENCE of LIVING
QUANTUM METHOD

quantummethod.org.bd

978-984-35-7459-6

978-984-35-7459-6